।। হঠাৎ একদিন ।।

হঠাৎ একদিন

আশাপূর্ণা দেবী

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০০০৬

হঠাৎ একদিন
আশাপূর্ণা দেবী

প্রথম সংস্করণ
মাঘ, ১৩৬৩
জানুআরি, ১৯৫৬

প্রকাশক
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক
স্মিতা আচারিয়া
অ্যাঞ্জেল প্রিণ্টার্স
৪৩৭ বি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
পূর্ণেন্দু রায়

ব্লক
রয়েল হাফটোন কোং

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
আশীষ প্রিণ্ট এ্যাণ্ড বক্স

॥ এক ॥

সকালের আকাশের চেহারাটা আজ এমন কিছু খারাপ নয়। বরং এক হিসেবে ভালই বলা চলে। ঘুম ভাঙার সময় রোদ উঠে গেছে দেখার থেকে একটু মেঘলা ভাব তো ভালই লাগে। ঘন মেঘ তো নয় যে দেখেই প্রমাদ গনে অফিস যাবার দুর্গতির চিন্তা এসে যাবে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কায়।

হালকা মেঘ, ওপারে সূর্যের উপস্থিতির আভাস রয়েছে।

ঘুম ভাঙতে বেশি বেলাও হয়নি আজ কৌশিকের, যেটা হলে মাঝে মাঝে শুধু শুধুই ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। সেদিন তুচ্ছ কারণে বউয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, অকারণে ছেলেকে ধমক কষিয়ে ফেলে।

আজ সে সব কিছু না। বেশ ভোরে ভোরেই ঘুম ভেঙেছে, এবং মুখ ধুয়ে আসা মাত্রই চা পেয়ে গেছে। কত কারণেই তো এই সামান্য পাওয়াটুকুও পাওয়া হয় না। হয়তো কোনোদিন উৎপলারই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়, হয়তো বা গ্যাস ফুরনো রান্নাঘরে কেরোসিন কুকার জ্বেলে চা বানাতে দেরি হয়ে যায় উৎপলার, কিম্বা হয়তো যেদিন মাদার ডেয়ারির দুধটা আসতে দেরি হয়ে যায় সেই দিনই দেখা যায় বিকল্প ব্যবস্থা আমূলের টিনটা সাফ হয়ে বসে আছে।

আজ ওর একটাও ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। ঘটলে উৎপলার তীব্র তীক্ষ্ণ অসন্তোষ 'বাণীমূর্তিতে' উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভোরের আকাশ বাতাস, এবং সমগ্র পরিবেশটাকেই বিদ্ধ করে ছাড়ত।

আজ কৌশিক যথারীতি সকালে উঠেই পাম্প চলার শব্দ পেয়েছে। তার অর্থ সংসারকে বানচাল করতে পাম্প রাতারাতি অচালু হয়ে বসে নেই, অথবা 'লোড শেডিং' নামক নিত্য অতিথির ভোর বেলাই আবির্ভাব ঘটেনি, এবং ঠিকে কাজের মেয়েটা যথাযথ সময়েই এসে গেছে। কারণ ওটাই ওর প্রথম ডিউটি, ওটাই ওর আবির্ভাবের 'জানান'।

কৌশিকের বোধ্য এবং অবোধ্য অনেক কিছু তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাতেও দারের ছন্দ ভঙ্গ হয়, ফলশ্রুতি উৎপলার সশব্দ স্বগতোক্তিতে বিরক্তি

প্রকাশ।

আজ কৌশিকের সংসারে কোনো ছন্দপতন নেই।

তবু—

আজ সকালে খালি চায়ের কাপটাকে টেবিলে বসিয়ে রাখার সময় কৌশিকের হঠাৎ মনে হল, 'জীবনের কোনো মানে নেই!'

কৌশিক গাঙ্গুলী, বয়েস আটত্রিশ, একটি বেসরকারি সংস্থার বেশ মাঝারি গোছের পদস্থ কর্মচারী, বাপের দরুণ কলকাতা শহরের বুকে একটা বাড়ি আছে, এবং উৎপলার নির্দেশনায় সে বাড়িকে কিছু আধুনিকীকরণ করানো হয়েছে। এই খরচটাকে সহজে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে কৌশিক যাতে কলকাতা শহরে আস্ত সুস্থ একখানা দোতলা বাড়ি রেখে যাওয়া সত্ত্বেও তার পরলোকগত বাবাকে ইহলোকের 'অসুবিধে জনিত' ঝঙ্কার না খেতে হয়।

কৌশিকের নিজেরও অবশ্য বাড়িটার ছোটখাটো এই আধুনিকীকরণে বেশ আরাম সুবিধে হয়েছে। যেমন এখন কৌশিক কাচের জানলা লাগানো বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে সকালের রাস্তার দৃশ্যটা দেখছে, এটা ছিল একটা খোলা গাড়িবারান্দা মত। গরম কালে রোদে কাঠ ফাটত, বর্ষায় জলে ভেসে যেত, ছাঁটের জ্বালায় সামনের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করতে হত, আর শীতের দিনে হাড়কাঁপানো হাওয়া সাপ্লাই করত। কাজে লাগানোর মধ্যে বিছানা রোদ্দুরে দেওয়া।

গরমের দিনের বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্তই যা একটু মনোরম ছিল। তাও রেলিং জুড়ে কাকদের 'প্রাতঃ' উল্লু 'সর্বসময়কৃত্য'র উৎপাতে রেলিঙে হাত দিয়ে দাঁড়াবার জো ছিল না। তাছাড়াও প্রায়শই পায়ের কাছে রাস্তার ডাস্টবিন থেকে তুলে আনা ডিমের খোলা, চিংড়ির খোলা, মোরগ বংশীয়ের ঠ্যাং ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকতে দেখার দরুণ একটা মাদুর বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ার ইচ্ছেটাও কার্যকরী হতে পেত না। অথচ এটা এ

স্রেফ একখানা কাচঘেরা চৌকো ঘরের মত হয়ে গিয়ে ড্রইংরুমের শ

দিচ্ছে।

বেতের একটা সোফাসেট পাতিয়ে নিয়েছে উৎপলা, মাঝখানে সেন্টারপীসে সাধারণ একটা ফুলদানিতে কিছু প্লাস্টিকের ফুল রাখে যেটা নাকি চির অমর। মোটের মাথায় বাবার আমলের সেই কাক-চিল অধ্যুষিত হু-হু হাওয়া, হু হু বৃষ্টি, ধূ-ধূ রোদের খোলা বারান্দাটা এখন বাড়ির মধ্যে সব থেকে সেরা জায়গা।

এ রকমটি হয়ে উঠতে কিছু 'কাগজের'র দরকার হলেও, এবং সেগুলো কৌশিকের পকেট সাপ্লাই করলেও, মগজ সম্পূর্ণ উৎপলার। সত্যি বলতে আশ্চর্য রকমের পরিষ্কার মগজ ওই মহিলার। এখানে তো সবাই কর্পোরেশনের কলের জলের ওপর নির্ভরশীল, প্রাণান্ত অভাবের সময় কেউ কেউ উঠোনের মেঝেয় গর্ত কেটে চৌবাচ্চা বানিয়ে, মাটির লেভেলে কলের ট্যাপ বসিয়ে কিছু সুরাহা করিয়ে নিয়েছে, কেউ কেউ বা চোট্টামি করে রাস্তার নিচের পাইপ থেকে আলাদা চওড়া ফেরুল বসিয়ে নিয়ে জলের সচ্ছলতা ভোগ করছে। নেহাৎ নিরুত্তমরা জল দেওয়া ভারী রেখেছে।

উৎপলাই দিদির বাড়ি বাঘা যতীনে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসে, দিদি অর্থাৎ –জামাইবাবুর সহায়তায় একতলায় রান্নাঘরের পিছনে হাত কয়েক পোড়ো জমিটুকুতে একখানা কুয়ো খুঁড়িয়ে পাম্প বসিয়ে অজস্র জলীয় সুখের পাকা ব্যবস্থা করে নিয়েছে আর কোথায় কাদের বাড়ি দেখে এসে ইনভাটার বসিয়ে লোড্‌শেডিঙের দুঃসহতা দূর করে ফেলেছে।

কৌশিকের দ্বারা যে এসব কিছুই সম্ভব হতো না, তা কৌশিক ভালই জানে, এবং স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। দ্বিধা করে না বলেই বেশ সুখেই আছে। জয়ের একটা বড় অস্ত্র আত্মসমর্পণ একথা কৌশিক মানে।

এছাড়া কৌশিকের একটাই মাত্র ছেলে এবং সে ছেলে প্রায় বিনা যুদ্ধে একটা নামী দামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে, আর মাত্র ক্লাশ থ্রীতেই ব্রিলিয়ান্টত্ব দেখিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা দেখতে ভাল, ছেলেটার মতিগতি ভাল. স্বাস্থ্য ভাল।

আর স্ত্রী?

সে তো বলাই হয়ে যাচ্ছে।

যদিও প্রেমে পড়ে বিয়ে করেনি কৌশিক বিয়ে করেই প্রেমে পড়েছিল, তবে সেটা বেশ জম্পেসই পড়েছিল। বাড়ি এবং বউ, এই দুটো জিনিসই কৌশিকের অনায়াসলব্ধ, তবু মোটামুটি বেশ ভদ্রস্থই।

এখনো উৎপলা যখন শখ করে খোঁপা না বেঁধে খোলা চুলের গোড়ায় একটা চওড়া ক্লীপ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, প্রায় কলেজ-গার্ল কলেজ-গার্ল দেখায়। এবং ছুটির দুপুরে দিনকে রাত করতে না পেরে উঠুক, ছুটির সকালে স্নানস্নিগ্ধ প্রসাধন-ঝলমলে চেহারাখানি নিয়ে সামনে এসে আহ্লাদে গা গড়িয়ে বলতে পারে, 'বাড়ি বসে বসে গেঁজিয়ে কী হবে, চলোনা কোথাও বেড়িয়ে আসি।' ···অথবা ছুটির আগের দিন থেকে জপায়, 'কতদিন শুধু দু'জনে সিনেমা দেখিনি, টুপাইকে মার কাছে চালান করে চলোনা গো দু'জনে একটা ভালো ছবি দেখে আসি।'

উৎপলার মতে 'ভাল ছবি' অর্থে ইংরিজি ছবি। কৌশিকের আবার এমন দশা, ইংরিজি ছবি দেখতে গিয়ে ডায়লগ্‌গুলো একেবারেই ধরতে পারে না, অথচ উৎপলা অবলীলায় ধরে ফেলে। তা সে যাই হোক উৎপলার ওই ঝলমলে মুখের জয় হয়।

এই ঝলমলানিটা এখনো বজায় রাখতে সক্ষম তো উৎপলা? একাদশটি বিবাহ বার্ষিকী পার করেও এমন রাখতে পারাটা কম কথা নয়। অতএব স্বামীর পক্ষে সেটা কম প্রাপ্তিও নয়।

তবে 'প্রেমে পড়ার' সেই প্রথম পর্যায়ের মত উচ্ছ্বাস কি আর আছে এখনো? না কী তাই থাকে? থাকলেও তো হাস্যকর হত, ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে না?

উনিশ থেকে তিরিশে আসতে, আর 'বউমা' থেকে 'বাড়ির গিন্নী'তে প্রমোশন পেয়ে যেতে যে বদলটুকু স্বাভাবিক সেইটুকুই মাত্র হয়েছে উৎপলার—তার অধিক নয়।

তবে কি আর, ঝি না আসা, গ্যাস ফুরনো, পাম্প খারাপ হয়ে যাওয়া গোছের ছোটখাটো ব্যাপারে দৈনন্দিনের ছন্দপতন ঘটলে, (ঘটতেই পারে, কবিতাতেই কি মাত্র একটি অক্ষরের এদিক ওদিকেও তা

ঘটে না ?) নিজ মনে বক বক করতে করতে, শেষ অবধি কৌশিককেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে ছাড়ে ? না কি কৌশিক সেই এক দশক আগের মত বউয়ের নামটাকে একটু অলটার করে 'উৎপাত' বলে ডাকতে সাহস করে ?

তাহলেও কৌশিক তার আশপাশের অনেকের থেকে, এমন কি তার বড়লোক 'তুতো' সব ভাইটাইদের থেকেও বেশ সুখী এবং সম্পন্ন ব্যক্তি।

অনেকে তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে।

তবু হঠাৎ আজ সকালে একটু মেঘ মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে 'কৌশিক' নামের লোকটির মনে হল, 'জীবনটার কোনো মানে নেই!'

॥ দুই ॥

কৌশিক 'সজ্ঞান' মন নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল হঠাৎ মনটা এমন বিষাদগ্রস্ত হয়ে যাবার হেতু কি!···গতকাল থেকে কি কি হয়েছে ভাবতে চেষ্টা করল, প্রায় তন্ন তন্ন করেই ভাবতে লাগল। কই, কিছুই তো খুঁজে পেলে না।

অফিসে কারো সঙ্গে কিছু হয়নি। না মতান্তর না কথান্তর। হয়ও না। 'গাঙ্গুলীদা' বলতে সবাই (অন্তত প্রত্যক্ষ গোচরে) অজ্ঞান। পিয়ন বেয়ারারা পর্যন্ত কৌশিককে দেখতে পেলে হাতের বিড়িটা হাত সমেত পিছনে নিয়ে যায়। না বলতেই কৌশিকের ঘরে রাখা কাচের কুঁজোটা ধুয়ে জল বদলে রেখে যায়।

কাল কোনো কিছুর ব্যতিক্রম হয়নি।

আগে আগে ভীড়ের বাসে আসা যাওয়া করার কালে মাঝে 'জীবন মহানিশা' মনে হত। এখন তো কবেই সে দুঃখ ঘুচেছে। কোম্পানি থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। যেটাকে জন চারেক 'একই পথের পথিক' পদস্থ জন অধিগ্রহণ করে যে যার বাড়ির সামনে নেমে পড়ার সুযোগ করে নিয়েছেন। কৌশিক সেই চারজনের একজন।

চারজনের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি আছে, আসা যাওয়ার পথটা অনেক

সময়ই সরস এবং মুখর থাকে।…কালও তাই ছিল।

চৌধুরী বলেছিলেন, গাঙ্গুলী, তোমার জুলপির চুল পেকেছে ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

কৌশিক অজান্তেই একবার জুলপির কাছে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, কই, দেখিনি তো ? পেকেছে নাকি ?

আহা, সেটা আমি জানব, না তুমি জানবে ?

আপনাদেরই জানা উচিত, আমি তো আর সব সময় আয়না হাতে নিয়ে বসে নেই। কবি বলেছেন, 'অপরের চোখই তোমার দর্পণ'।

বটে না কি ? কথাটা তো বেড়ে হে ? কোন কবি বলেছেন ?

গুপ্ত বলে উঠেছিল, ছাড়ুন না চৌধুরীদা, যখন যা ইচ্ছে কোটেশান দিয়ে গাঙ্গুলী অনায়াসে 'কবি বলেছেন' বলে চালিয়ে দেয়।

আহা. গাঙ্গুলীকেই বা কবি ভাবতে বাধা কী ?

চৌধুরী বাকি তিনজনের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং পদস্থ, তবে লোক বড় মাইডিয়ার। তাই ওই বয়েসের এবং পদমর্যাদার দূরত্ব অনায়াসে উড়িয়ে দিয়ে মিশে যান, এবং সকলকে 'তুমি' করে বলেন।

গুপ্ত বলল, তাই না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু হঠাৎ গাঙ্গুলীর জুলপির চুল পাকার প্রশ্ন কেন ?

কাল গিন্নীর সঙ্গে জোর তর্ক, বাজি ধরেছি—

তর্কটা কী নিয়ে ?

ওনার মতে বুদ্ধিমান লোকদের জুলপির চুল খুব তাড়াতাড়ি পাকে ; বেকারদের পাকে না।

কৌশিক হেসে ফেলে বলেছিল, আপনার বুঝি পাকেনি চৌধুরীদা ? বাকিরা হেসে উঠেছিল।

চৌধুরী করুণ ভাবে বলেছেন, সেই তো। গোঁফটা পেকে ওয়ার হয়ে গেল, একদিন না কামালে মনে হয় নাকের নিচে এক গোছা আলপিন ফোটানো রয়েছে, ঘাড়ের দিকেও বেশ কিছু, কিন্তু জুলপি পাকেনি। জুলপি নাকি কাকের পালক। গিন্নী বলেছে, আচ্ছা আজ থেকে সমীক্ষা চলিয়ে যাও, দেখো কে বাজি জেতে। তুমি আমার

ফরে হয়ে যাও ভায়া।

বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে। বলেছিল কৌশিক।

একেবারে হালকা কৌতুক। মানে ব্যঙ্গ নয় রঙ্গ।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির ঘটনায় এসে গেল কৌশিক।

যথারীতি কৌশিক আসা মাত্রই উৎপলা চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, টুপাই পড়তে পড়তেও উঠে এসে বাবার হাতের ব্যাগটা বাগিয়ে ধরে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল।

এটা তার মা তাকে শিখিয়েছে।

কিছু শিখলে, অর্থাৎ শেখালে টুপাই কখনো ভোলেনা।

অন্য অন্য বাড়িতে সমীক্ষা চালাও, ত্মাখো কটা ছেলে টুপাইয়ের মত।

আচ্ছা, কাল উৎপলা কী খাবার বানিয়ে রেখেছিল ?

মনে পড়েছে। ভাল স্যাণ্ডউইচ্।

চা খাওয়ার পর এই বারান্দা-ঘরে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল উৎপলা, যাদের মধ্যে যোগসূত্রের কোনো বালাই নেই। বাজারদর থেকে টি ভি প্রোগ্রাম, রাজনীতি থেকে ফুটবল, লতুদির মেয়ের বিয়ের অকারণ অপচয় থেকে 'কাজের মেয়ে'টার দুষ্টুবুদ্ধি।

মুহূর্তে মুহূর্তে প্রসঙ্গ পালটাতে পারে উৎপলা, এবং অপরের সমর্থন অসমর্থনের কোনো ধার ধারে না।

সন্ধে থেকে রাত্রে চলে এল কৌশিক। রাত্রে ঠিক মতই রুটি মাংস ভাল খেয়েছে, গুনতির বেশি রুটি খায়নি। রাত্রি যথারীতি অভ্যস্ত মধুর। শোবার সময়—বউ দেয়ালমুখো হয়ে শোয়নি, এবং 'আঃ কী রোজ রোজ' - বলে বেজার হয়নি।

রাত্রে লোডশেডিং হয়নি, পাখা সারারাত সার্ভিস দিয়েছে, নির্বিঘ্ন ঘুমই ঘুমিয়েছে।

অথচ আজ, এই সকাল বেলা আটত্রিশ বছরের কৌশিক গাঙ্গুলীর যার এখনো জুলপির চুলে পাক ধরেনি, তার মনে হল—'জীবনের কোনো মানে নেই!'

উৎপলাকে অবশ্য এ নিয়ে কিছু বলতে এল না। জানে, বলতে এলেই উৎপলা বলবে 'পেটে গ্যাস হয়েছে। ডাবরের জোয়ান হজমি খেয়ে নাও একটু।'

ছেলের ঘরে চলে এল।

ঝকঝকে মুখ তকতকে গা টুপাই স্নান সেরে স্কুল ড্রেস পরে নিয়ে ডট্‌পেন-এ নতুন রিফিল পরাচ্ছে।

ছেলের এই সকালের চেহারাটি যেন চোখ জুড়নো। ভারী ভাল লাগে কৌশিকের, আজও একটু লাগল, কিন্তু ভারী ভারী একটা বিষণ্ণতার চাপের তলা থেকে।

কথা বলতে হয় তাই বলল, তোর বাস আসতে তো দেরি রয়েছে, এক্ষুনি রেডি?

টুপাই তার ফর্সা ধবধবে সুপুষ্ট সুগোল কব্জিটা ঘুরিয়ে দেখে বলল, দেরি নেই, তোমাদের ঘড়ি স্লো।

টুপাই ক্লাস থ্রীতে পড়ে, এক্ষুনি তার হাতে ঘড়ি উঠেছে।

আবদার-টাবদার করেনা টুপাই, শুধু উদাহরণ পেশ করে। আমাদের ক্লাশে প্রায় সব ছেলেরই ঘড়ি আছে।

কৌশিক অবশ্য শুনে তাজ্জব হয়েছিল, বলেছিল, সে কীরে! তোদের ক্লাশে? এইটুকু ছেলেরা?

আমি বাজে কথা বলিনা বাপী, গিয়ে দেখে আসতে পার।

উৎপলা তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। ও নিয়ে আর বাপীকে বলে লাভ কী? তোর বাপী এখন চট করে নিজের ক্লাশ থ্রীতে চলে গেছে।

দিন দুই পরে ফর্সা গোল গোল হাতে নতুন ঘড়ি বেঁধে স্কুল বাসে গিয়ে উঠল টুপাই নতুন ঘড়ির মতই ঝকঝকে মুখ নিয়ে।

টুপাইয়ের বাস আসার সময় উৎপলা বারান্দায় এসে দাঁড়াবেই। যত কাজই থাক। অতএব কৌশিকও। তার গাড়ি আসে এর একঘন্টা পরে। কৌশিক বারান্দায় এসে দাঁড়ায় হয়তো গালভর্তি সাবানের ফেনা নিয়ে, হয়তো বা দ্বিতীয় প্রস্থ চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই।

উৎপলা অবশ্য এ রকম দেখলেই হতাশ গলায় বলে, তোমায় আর সভ্য করা গেল না।

কৌশিক হাসে। বলে, এতে তোমার ব্যাক গ্রাউণ্ডটা কত জোরালো হয় বলো।

হ্যা, সেই জন্যেই তো চিরকাল যত বিদঘুটেপনা করে আসছ।

তা বলে সত্যিই যে কৌশিক সর্বদা বিদঘুটে কিছু করে বেড়াচ্ছে তা নয়। বড়জোর এই সাবানের ফেনা অথবা চায়ের কাপ। চিরকালের অভ্যাসে চানের সময় 'গামছা' বলে হন্যে হতো, সেটা ছাড়িয়ে ছেড়েছে উৎপলা। এবং এখন কৌশিক নিজেই ভাবতে পারে না তোয়ালের বদলে গামছা ব্যবহার করছে।

আসলে উৎপলার ওই বলাটা একটা লীলা।

টুপাইয়ের নতুন ঘড়ির দিনে উৎপলা হাসি হাসি মুখে বলেছিল, এ মাসে বাজেটে বেশ কিছু কাটছাঁট করতে হবে। কী আর করা? ওই আলো-আলো মুখটার জন্যে অনেক দাম দেওয়া যায়, কী বল?

কৌশিক আর বিপরীত কী বলবে উৎপলা যা বলছে তাছাড়া? তাছাড়া—কৌশিক নিজেই কি মানেনা সেটা? কিসের জন্যে কতটা দাম দেওয়া যায়?

আজ সেই ঘড়িটার কাঁটায় চোখ রেখে টুপাই বলল, তোমাদের ঘড়ি 'স্লো' আছে।

উৎপলা যখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন লক্ষ্য করেনি, লক্ষ্য পড়ল বাস চলে যাবার পর।

খেতে বসার সময় কথাটা তুলল উৎপলা। আজ টুপাইয়ের বাস যাবার সময় তুমি ছিলে না।

প্রশ্নও নয় অভিযোগও নয়। কেমন একটা মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ নির্লিপ্ত উচ্চারণ। ছেলের সমাদরের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষেত্রে এই রকমই নির্লিপ্ত নালিশ উৎপলার।

জানে যে ব্যাপারটা খুব কড়া জরুরি নয়, উড়িয়ে দিলে দিতে পারে

কৌশিক, সেখানে উৎপলা এই রকম একটা নির্লিপ্ত সুর ব্যবহার করে। যেন শুধু মনে পড়িয়ে দেওয়া—তোমার একটা কর্তব্যে ত্রুটি হয়ে গেছে। হয়তো বৃহৎ কিছু নয়, তবু কর্তব্য তো বটে।

আসলে—উৎপলার নিজের যেখানে আবেগ আছে, আহ্লাদ আছে, সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন আছে, সেখানে উৎপলা কৌশিককে সঙ্গী পেতে চায় আর কিছুই নয়। আর সেই পাওয়াটা পেতে চায় অধিকারের বাহু প্রসারিত করে নয় প্রত্যাশার হাত বাড়িয়ে।

উৎপলা সংসারের সব কাজ সব দায়িত্ব ঘাড় পেতে বহন করতে পারে, এবং করেও, শুধু চায় যে কৌশিক সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করুক, এবং সেটা একটু প্রকাশ করুক।

তা নইলে কৌশিককে তো উৎপলা গায়ে আঁচটি পেতে দেয় না। এর চাইতে সুখের অবস্থা একজন সংসারী ব্যক্তির পক্ষে আর কী হতে পারে।

কৌশিকের নিজের জামাইবাবুই তো বলেন, কী একখানা ৩াক করে এসেছিস ব্রাদার, মাইরী! 'আসছে জন্মে যেন এরকম একখানা গিন্নী পাই' এই প্রার্থনা করে মরব।

অথচ কিনা কৌশিক নামের এই আটাত্রিশ বছরের যুবকটির হঠাৎ মনে হচ্ছে জীবনের কোনো মানে নেই।

উৎপলার নির্লিপ্ত স্বরের অব্যাহত করিয়ে দেওয়া কথাটা শুনে অবাকই হল কৌশিক। বাস আসবার সময় ছিলাম না? সে কী? ছিলাম তো।

না ছিলে না।

বাঃ, বললেই হল? ও যাবার সময় হাত উল্টে নিজের ঘড়িটা দেখে বলল, তোমাদের ঘাড় স্লো।

উৎপলা এখন একটু তীক্ষ্ণ হল, বলল—আমাদের ঘড়ি স্লো! কোথা থেকে বলল? রাস্তা থেকে?

কৌশিক অপ্রতিভ হল, আরে তাইতো। কোথা থেকে বলল।

অন্যমনস্ক গলায় বলল, সত্যি তো। কখন বলল? ওঃ—আগে

বলেছিল। আমার মাথায় ওই ঘড়িটা স্লো হওয়ার কথাটাই ঘুরছিল, তাই –

ঘুরছিল? তা সেটা ঠিক করে দিয়েছ তো?

নিরীহ গলা উৎপলার।

ঘড়ি ঠিক করা!

সেও তো আর এক পালা অস্বস্তি।

উঁচু দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটাকে উৎপলাই তো বরাবর ঠিক রাখে উঁচু টুলে উঠে।

বলল, আমি? কই না তো!

উৎপলা মুখ টিপে হাসল, ঘড়িটার বেঠিক হওয়াটা মাথায় ঘুরছিল, বলছ, তাই বলছি।

অফিস গাড়ির চারজন এক হপ্তেই (মানে চৌধুরীই শেষে ওঠেন) চ্যাটার্জী বলে উঠল, কে বাজি জিতল চৌধুরীদা?

কিসের বাজি?

ওই যে জুলপি পাকার সঙ্গে বুদ্ধির প্রশ্ন?

না৹! তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। সেই কথা মনে রেখে বসে আছে?

বা', রাখবনা? বউদি জিতলেন না আপনি জিতলেন, জানতে হবে না?

এ হে হে। এইটা কি একটা কথা হল হে? তিনি হারবেন আমি জিতবো? আরে সমীক্ষার রিপোর্টটা কার কাছে?

তার মানে আপনি ইচ্ছে করেই বাজি জিতিয়ে দিলেন?

এরপরও আবার 'মানে'? তবে নতুন কিছু করিনি, সারাজীবন যা করে আসছি। নিজে বাজি জিততে চাইলে কী আর—হু৹।

আপনি চৌধুরীদা আমাদের বউদিকে যত প্রবলা বলে বোঝাতে চান, মোটেই কিন্তু তিনি তেমন নন।

তেমন নন? চৌধুরী বললেন, তোমরা তাঁর কতটুকু জানো হে?

ন্তু'একদিন বেড়াতে গিয়ে চা সিঙাড়া খেয়ে এসে কোনো মহিলাকে চিনে ফেলার অহঙ্কার কোরো না।

এরা ছাড়া আরো অনেকেই জানে স্ত্রী-সম্পর্কে এরকম অপপ্রচার চৌধুরীর একটা বিলাসিতা। আসলে মহিলা রীতিমত নিরীহ এবং ভীতু ভীতু। এ যুগেতে, সেকালের স্ত্রীদের মত স্বামীকে ভয় করেন। চৌধুরীদা বাইরে মাইডিয়ারি হলেও, বাড়িতে বেশ জবরদস্ত। এসব জানার সূত্র কার কাছে যেন আছে, কিন্তু সেটা কেউ প্রকাশ করে না। ···উনি ওঁর বিলাসিতা বিস্তার করে মহিমা বিকীর্ণ করেন।

খবরটা জানা হলেও, সকলেই ওনার কথায়, রস উপভোগের তালে তাল দিয়ে যায়। কৌশিকও তাই দিয়ে এসেছে এতদিন। বরং বেশিই। কৌশিকের বাক্‌পটুতা, সরস উক্তি, ওঁকে আরো মদত দিয়েছে।

কিন্তু আজ কৌশিকের মনে হচ্ছে, একটা সস্তা মার্কা অসার রসিকতা নিয়ে এরা এতক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে কী করে? কেনই বা?

মনে পড়ল না গতকালও সে নিজে এদের দলেই ছিল। এবং এদের মতই উপভোগও করেছে।···অনেক দিনই উৎপলার কাছে সেই দিনের প্রসঙ্গের উল্লেখ করে সরস টিপ্পনি দিয়ে শুরু করত আজকে বুঝলে—?

অথচ আজ কিনা হঠাৎ এদের এখানে একটা বোমা ফেলল। বলে উঠল. আশ্চর্য! এতক্ষণ ধরে সবাই মিলে এই একটা ফালতু কথা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন কী করে?

অ্যাঁ! অনুক্ত এই 'অ্যাঁ'-টা উচ্চারিত হল না। মুহূর্তে তিন-তিনটে মানুষ স্রেফ ফ্রিজ!

চোখের সামনে একটা বোমা পড়লে এর থেকে বেশি আর কী হতো?

লোকটা হঠাৎ এ রকম ছোটোলোকমি করে বসল—মানে? কোন সাহসে?

বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে ?

এসেছে তো এসেছে, তাই বলে বাইরে এসে তার ঝাল ঝাড়বি। ঠিক বেরোবার মুখেই, ঝগড়া, কথা কাটাকাটি, বচসা, কার না হয় ?.... মহিলাদের তো যাবতীয় অভিমান অভিযোগ অন্যায় আবদার, স্বামীর সারা জীবনের দুর্ব্যবহারের ফিরিস্তি দাখিল করে করে আক্ষেপ সব এই কাজে বেরোবার মুখেই। কারণ দেখছেন তো আসামী অনেকক্ষণের মত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সময়ই বা কোথা ? নিজেদেরকেও তো বাড়িছাড়া হতে হয়। সবাই তো স্বাবলম্বী। সন্ধ্যায় ছেলে মেয়ের পড়া আছে, টীচার আসা আছে—টি ভি আছে। সে যাক, যদিই বা কিছু তিক্ত বিরক্তির কারণ ঘটেই থাকে বাড়িতে, বাইরে এসে অন্য লোককে অপমান করবি ?

আচমকা ধাক্কাটা পরিপাক করে নেবার সময়টুকু নিয়ে গুপ্ত কটু গলায় বলে উঠল, ফালতু লোকেরা ফালতু কথাই কয় গাঙ্গুলী।

চ্যাটার্জী বলল, আশ্চর্য হবার কারণ সকলেরই সব সময় ঘটে !

চৌধুরী অবজ্ঞার গাম্ভীর্যে বললেন, থাক থাক, যেতে দাও। গাঙ্গুলী বোধ হয় রাতারাতি গুরুদীক্ষা নিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মে বৃথা কথা নিষেধ।

॥ তিন ॥

সতীশ কাচের কুঁজোটা ধুয়ে ভরে রাখতে গিয়ে যথারীতি আস্তে সাহেবের ঘরের দরজার পর্দাটা একটু সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, সাহেব চেয়ারে নেই। অতএব বাথরুমে।

কুঁজোটা আর গ্লাশটা বার করে এনে সাবান দিয়ে ধুয়ে জল ভরে নিয়ে এসেও দেখল চেয়ার খালি।···মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল, আস্তে বেরিয়ে এল।

আজ গোটাকতক টাকার দরকার ছিল। দেশ থেকে চিঠি এসেছে ভাইয়ের খুব অসুখ। সময় অসময়ে গাঙ্গুলী সাহেবের কাছেই সে আর্জি জানায়। এটাই অভ্যাস...টুকটাক দশ পনের টাকা সাহেব আর

ফেরতও নেন না। বলেন, থাক ওটা, তোমার বাড়ির ছেলেমেয়েকে মিষ্টি কিনে দিও। ওর তো আর নেই, বাড়িরই।

এদিক ওদিক ঘুরল সতীশ, অন্য সাহেবদের পর্দা ফেলা ফেলা দরজার দিকে একটু একটু চোখ ফেলতে লাগল, যদি অন্য কোনো ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সাহেব।

লিফ্‌ট্‌ম্যানকে জিগ্যেস করল, আশাপ্রদ কিছু শুনল না। সে তো এইমাত্র দুটোর পরের শিফটে এল।

ভারী জরুরী দরকার টাকাটা।

সতীশ দারোয়ানের কাছে নেমে এল।

শুনল পৌনে দুটোর সময় বেরিয়ে গেছেন গাঙ্গুলী সাহেব।

খুব দুঃখ হচ্ছে সতীশের, একটু যেন অভিমানও। জন্মজীবনে গাঙ্গুলী সাহেবকে দুপুরে বেরোতে দেখা যায় না, আর আজই সতীশের বিশেষ দরকারের দিনে—

সতীশের অবশ্য মনে পড়ল না এমন কত 'বিশেষ দরকারের' গাঁট পার হয়ে হয়ে আসছে সে। দারোয়ানের কাছে তো এ মাসে ইতিমধ্যে দু পাঁচ করে নেওয়া হয়ে গেছে। আর বলা সম্ভব নয়।

সাহসে ভর করে বাথরুমের প্যাসেজের কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সুফল ফললও।—চ্যাটার্জী সাহেব সেখানে গেলেন এলেন। এই হচ্ছে মহামুহূর্ত। বিনীত নিবেদনে গুজ গুজ করে কথাটা বলে ফেলল সতীশ।

সতীশের সঙ্গে কৌশিক গাঙ্গুলীর বিশেষ আঁতাতের খবর অল্প বিস্তর সকলেরই জানা। লোকটা বিয়েফিয়ে করেনি, অথচ কী ঘোর-তর সংসার জালে জড়িত। এবং সংসার জ্বালায় জর্জরিত। সে কথা কখনো কখনো হেসে হেসে বলছে কৌশিক, এবং বলেছে সেই জন্যই লোকটার ওপর 'ছেদ্দা' হয়।

চ্যাটার্জী বলে উঠল, আমি? আমি হঠাৎ পঞ্চাশটা টাকা কোথায় পাব? কেন, আপনার ব্যাঙ্কার কোথায়? গাঙ্গুলী সাহেব?

কৌশিক ব্যতীত সকলেই 'সতীশকে' আপনি করে কথা বলে। না

বললে, সতীশ না হলেও অন্যেরা অসন্তুষ্ট হয়।

'ব্যাঙ্কারের' ঘটনাটা বলল সতীশ।

চ্যাটার্জি বলল, তাই নাকি? অফিসের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন কিনা জানেন?

সতীশ মাথা নাড়ল।

'জানেনা' বলে নয়, 'নিয়ে বেরোয়নি' বলে, কারণ সতীশ সেদিক-টাও তল্লাসি করে এসেছে।

আমার কাছে টাকা হবে না।

বলে চ্যাটার্জি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

ফেরার সময় গাড়িতে তিনজন।

গাঙ্গুলী সাহেব?

তিনি পৌনে দুটোর সময় বেরিয়ে গেছেন, এখনো ফেরেন নি।

খবরটা একমাত্র দারোয়ানের কাছে ছিল।

ব্রীফকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল?

খবরদাতা ঠিক মনে করতে পারল না, তবু বলল, 'জী হাঁ।'

সাহেবদের তো কখনো ওইটি হাতছাড়া করতে দেখে না।

মাঝে মধ্যে দুপুরে বেরোন কোনো কোনো সাহেব, বলা বাহুল্য অফিসের গাড়িটারই সদ্ব্যবহার করে—তবে ওইটি ঠিকই হাতে থাকে।

তার মানে আমাদের অ্যাভয়েড্ করা।

গুপ্তর গলায় কুটু ঝাঁঝ।

চৌধুরী বললেন, না-ও হতে পারে, সামথিং কিছু হয়েছে মনে হয়।

কী হতে পারে চৌধুরীদা? বউ-ছেলের অসুখ করলে আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহারের কোনো কারণ নেই। না না, হঠাৎ নিজেকে খুব সংস্কৃতিসম্পন্ন মনে হয়েছে।

হোক। দুটো দিন দেখতে দিন। বাসে ট্রামে অফিসে যাতায়াত করতে হলেই—

॥ চার ॥

কিন্তু সত্যিই কৌশিক গাঙ্গুলী হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল কেন ? দুপুর রোদে গেল কোথায় ?

ঠিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কি বেরিয়ে পড়েছিল 'কৌশিক গাঙ্গুলী' নামের যুবকটি ?

বয়েস আটত্রিশ, এই বয়েসেই দুর্জয় ইঞ্জিনীয়ারিং-এর একজন পদস্থ অফিসার। বাপের দারুণ বাড়ি আছে। বাড়িতে ত্রিশ বছর বয়েসের অতি সুদক্ষ চৌকস সুন্দরী প্রেমময়ী স্ত্রী আছে। নম্র সভ্য মার্জিত একটি আট বছরের ছেলে আছে।.......

জীবনে কখনো স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে কোথাও যায় নি। বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে একা যেতে ইচ্ছে হলে বউকে বলে যায়। প্রকারান্তরে সেটা বউয়ের পারমিশান নেওয়াই।

অফিস থেকে রোজ একবার করে বাড়িতে ফোন করে। কথা কিছুই নয়, শুধু জানান দেওয়া—আমি আছি ! তোমারই আছি।

সেই মানুষ হঠাৎ কাউকে কিছু জানান না দিয়ে ঠা ঠা রোদ্দুরে অফিসের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে বসতে গেলে কেন ?

'জীবনের কোনো মানে নেই' বলে ?

বাস থেকে নেমেই খেয়াল হল কৌশিক গাঙ্গুলীর, টিফিনটা খাওয়া হয়নি আজ।

বোধহয় কিছু খাওয়া দরকার, অন্তত কিছু পানীয়।

কী খাওয়া যায় ? গরম না ঠাণ্ডা ? চা না কাম্পাকোলা ?

আচ্ছা, আরও একটা জিনিসও তো রয়েছে। সেটা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেরই প্রিয় পানীয়।

আশ্চর্য, কোনদিন তো খাওয়া হয় নি। অথচ কৌশিকের বাবা প্রতিদিন ভাত খেয়ে উঠে একটা করে ডাব খেতেন।

বাস স্ট্যাণ্ডের ধারেই একটা কোণের দিকে ডাঁই করে ডাব রেখেছে। ডাবওয়ালারাও আজকাল স্ট্র দেয়।.......

ডাবই নেওয়া যাক। বেখাপ্পা একটা জায়গায় অন্য কিছুর বদলে ডাবই ভাল, কোনো ভাবেই কোন জার্মের আশঙ্কা নেই।

কিন্তু ডাবের স্তূপের সামনে যে লোকটা রোদের দিকে পিছন করে, ডাবে মুখ জুবড়ে, অথবা মুখে ডাব জুবড়ে দাঁড়িয়ে আছে, কে ও?

ভঙ্গিটা খুব যেন চেনা চেনা।

ও সামনে ফেরার আগেই এখান থেকে সরে পড়বে নাকি কৌশিক? না হয় ডাব খাওয়া না হল, ওই তো ওখানে পানের দোকানের নিচের বরফের বাক্সের মধ্যে বসানো ঠাণ্ডা পানীয়ের সম্ভার।

ভাবতে তো দু-এক সেকেণ্ড।

উল্টোমুখো হতে আর দু-এক সেকেণ্ড, তবু শেষরক্ষা হল না। লোকটা বোধহয় ডাবের খোলাটা সবেগে দূরে নিক্ষেপ করতেই দুহাতে উঁচু করে তুলে ধরে ঘুরে দাঁড়াল, আর মুহূর্তে রৈ রৈ করে উঠল, আরে তুই? এখানে এমন সময়?

কৌশিক বলল. সেকথা আমিও তোকে জিগ্যেস করতে পারি।

আরে আমি তো আজকাল এখানেই চলে এসেছি। কলকাতার থেকে শালখেয় বাড়িভাড়া খুব কম না হলেও অনেক কম। তাছাড়া কাছেই শালীর বাড়ি, সময় অসময়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।

শালীর বাড়ি। ওঃ সেটাই বল।

বাঃ, শুধু সেটাই বলব কেন? আমার কারখানাটাও তো এখানে নিয়ে এসেছি।

কারখানা?

কৌশিক জানতনা তার সমবয়সী পিসতুতো ভাই রথীনের একটা কারখানা ছিল, এবং আছেও এখনো, যেটাকে এখানে উঠিয়ে এনেছে।

কিসের কারখানা? কে জানে? অনেকদিন আগে এক সময় রথীন কৌশিককে দারুণ ভাবে ধরেছিল কৌশিকের দুর্জয় ইঞ্জিনীয়ারীং-এ একটা চাকরি করে দেবার জন্যে।....কিছু না হোক সুপারভাইজার।

রথীন তো ছেলেবেলায় মামার বাড়িতেই মানুষ। দুজনে একই

স্কুলে পড়েছে। একসঙ্গে খেয়েছে খেলেছে থেকেছে, আড্ডা দিয়েছে। কৌশিকের বাবা নিজের ছেলে এবং বিধবা বোনের ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কোনো তারতম্য রাখেন নি, খাওয়া পরা শোওয়া থাকা কোনো ব্যাপারেই নয়। কিন্তু যে যা হবার তাই হয়। যে যা না হবার. তা হয় না।

রথীন খড়্গপুরে আই আই টি-তে তিন-তিনটে বছর পড়ে ছেড়ে দিল। বলল, ও আমার দ্বারা হবে না। ..মামা বললেন, তবে তোমার দ্বারা যা হয় সেটাই কর।

রথীন কিছুদিন যাবৎ তার দ্বারা কী সম্ভব তার 'এক্সপেরিমেণ্ট' করে করে অবশেষে একদিন মামার হাতের লাটাইয়ের সুতো থেকে ছিঁড়ে কাটা ঘুড়ির মত হাওয়ায় ভাসল, গাছে পালায় গোঁত্তা খেল, তারপর আর যোগসূত্র তেমন জোরালো থাকল না।

আসল যোগসূত্রটিও তো ততোদিনে খতম।....দুই ভাইবোনই গত হলেন।

মাঝে মধ্যে দেখা হতে হতে ক্রমশ সম্পর্কটা ধূসর হয়ে এসেছিল। সেই সময় রথীন কৌশিকদের কোম্পানিতে চাকরির চেষ্টা করেছিল। দুর্জয় ইঞ্জিনিয়ারিং অবশ্য তখন এতটা হয়ে ওঠেনি। প্রথমে শুরু করেছিল পাখার ব্লেড্ তৈরি করা নিয়ে। অতঃপর প্রেসার কুকার, ওভেন, হীটার, টোস্টার, অতঃপর ফ্রিজ্ এবং এখন কী নয়? এখন তো কোম্পানির কোটি কোটি টাকার কারবার। 'দুর্জয় ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর মাল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। ডিরেক্টরদের কাছে বিদেশটা জলভাত।

কিন্তু রথীনের জন্যে কৌশিক কিছুই করে উঠতে পারেনি '....বলেছিল, চাকর আবার চাকরি করে দেবে কী করে বল?

তারপর কবে যে রথীন নিজে কোনো একখানে কিছুর একটা কারখানা খুলেছিল, এবং সেটাকে আবার তুলে এনে শালখে নামক একটা জায়গায় স্থাপন করেছে—কৌশিক জানে না।

কৌশিকের হঠাৎ মনে হল, অথচ এই রথীনের সঙ্গে আমি একদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থেকেছি, এক খাটে শুয়েছি। এক জামা জুতো টেনে পরেছি।

॥ পাঁচ ॥

তার মানে 'জীবন' একটা ধারাবাহিক ব্যাপার নয়, খণ্ড খণ্ড কতক-গুলো অংশের সমষ্টি মাত্র। শৈশবের আমি, বাল্য, কৈশোর যৌবন এবং এই মধ্য যৌবনের 'আমি' —এরা কি একটা আস্ত ব্যাপার?

ইতিহাসের এক-একটা পিরিয়ডের মত একে ভাগ ভাগ করে নামকরণ করা যায় না? যেমন গুপ্তযুগ, পালযুগ, সেনযুগ। বলতে হবে কৌশিক গাঙ্গুলীর তাহলে এখন বেশ দীর্ঘস্থায়ী 'উৎপলা যুগ' চলছে। অন্য সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন, 'স্বায়ত্তশাসনের' আওতায়। তার আগে ছিল 'পিতৃযুগ'

রথীন বলল, কী? আজ তোর 'অফ ডে' বুঝি? দিদির বাড়ি এসেছিলি?

দিদির বাড়ি!

ও, তাইতো, শালখেয় কৌশিকের দিদির বাড়িই তো।

হঠাৎ অফিস থেকে বেরিয়ে কৌশিক তাহলে দিদির বাড়ির দিকে চলে এসেছে? আদৌ কিছু না ভেবেই। আশ্চর্য তো!

কৌশিক নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, যাইনি, যাব।

যাস পরে, তার আগে গরিবের বাড়িতে একবার ঢুঁ দিয়ে যা।

এখনো সেই রকম চাষাড়ে কথাবার্তাই চালিয়ে যাচ্ছিস?

তবে? বরং কুলি মজুরদের সঙ্গে মিশে মিশে আরও। চনচনে রোদ থেকে কিছু না হোক ছাদের তলার ছায়া তো পাবি? পড়ন্ত বেলার রোদটা বড় ডেঞ্জারাস। ওই যে ওই বাড়িটা—

ভাড়া নিয়েছিস?

না তো কি বানিয়েছি? এ কী আর কৌশিক গাঙ্গুলী?

কৌশিক গাঙ্গুলীর তো বাপের রেখে যাওয়া বাড়িতে বড়মানুষী।

ছাড় ওকথা, তুই এখন ইচ্ছে করলে ওরকম দু-চারখানা বাড়ি বানাতে পারিস।

এই রকমই ভাবিস তোরা?

যা ফ্যাক্ট তাই ভাবি। যেখানে আছিস, ইচ্ছে করলেই লাল হয়ে যেতে পারিস।

শুনে খুশি হলাম।...এত কাছে বাড়ি তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছিলি কেন?

রথীন একটু দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু অপরাধী-অপরাধী হেসে বলল, দুপুরবেলা কারখানা থেকে ফেরার সময় ওই কেমন একটা নেশা হয়ে গেছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খেলে তো স্বার্থপরের মত একটা নিয়ে গিয়ে খাওয়া যায় না।

॥ ছয় ॥

রথীনের এই অবস্থায় ঘর-বাড়ির চেহারা যেমন হওয়া স্বাভাবিক ঠিক তেমনই। আর্থিক দৈন্য এবং রুচির দৈন্য এই দুইয়ের যোগফলে যা হয়ে থাকে।

যে ঘরে বাইরের লোককে এনে বসাতে হয়, সে ঘরে কেন দেওয়ালে দড়ি টাঙিয়ে গামছা আর লুঙ্গি শুকোতে দেওয়া হয়েছে সেটা ভাববার বিষয়। জিনিস দুটো অবশ্যই রথীনের।

কৌশিক না বলে পারল না। আঙুল দেখিয়ে বলল, এর মানে কি?

মানে? মানে হচ্ছে ঠিক সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়।

বলেই বলে উঠল, আরে ভাই শালা রথীন ভট্চাযির কাজের আবার মানে। হতভাগার জীবনেরই কোনো মানে আছে নাকি? এ কি আর কৌশিক গাঙ্গুলী!

তার মানে রথীন ভাবছে কৌশিক খুব একটা মানে-ওলা জীবন ভোগ করছে।

এখানে বসে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল কৌশিকের। বলল, জীবনের তো কোনো মানে না হয় নেই, কিন্তু পাশের ঘরের কলকোলাহলে তো মালুম হচ্ছে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জীব সৃষ্টি করে ফেলেছিস। সেটার কী মানে?

ধরে ফেলেছিস ? হ্যা হ্যা হ্যা।

রথীন ছ্যাবলার মত হেসে বলে উঠল, তবু তো গিন্নীকে শাসিয়ে এসেছি, খবরদার যেন ওরা এঘরে না আসে। তবে গলা বন্ধ করা তো সম্ভব নয়।

এ শাসানোর মানে ?

কী আর বলি বল ভাই, তোর সামনে বার করার মত হালই নয়। যেমন চেহারার ছিরি, তেমনি সাজসজ্জার।

চমৎকার ! কটি শুনি ?

তা গোটা পাঁচ ছয় হবে।

অ্যাঁ !

মুখ ফস্কেই বলে ফেলে কৌশিক।

রথীন একটু ছ্যাবলা হাসি হেসে বলল, চমকে গেলি ? তা যেতে পারিস। তবে আমি শালা ওসব 'সুখী পরিবারে' টরিবারে বিশ্বাসী নই। মা সর্বদা আক্ষেপ করে বলত, একটা পয়সা আবার পয়সা, একটা ছেলে আবার ছেলে। ছেলেপুলে হল জনবল। কথাটা অনুধাবন-যোগ্য। এই আমি যদি হঠাৎ ফুট্ ফটাস হয়ে যাই, গিন্নীর তো তবু কিছু জনবল থাকবে।

যুক্তিটা ভালই খাড়া করেছিস। গিন্নীরও তাই মত ?

গিন্নীর মতামতের ধার কে ধারে ?

বলেই রথীন একটু মিচকে হাসি হাসল, মেয়েছেলের সাইকলজিই আলাদা। প্রথমটা বলবে, গলায় দড়ি দেব, বিষ খাব, তারপর যেই সেটি ভূমিষ্ঠ হবে একেবারে প্রাণের পুতুল। আরে তুইও যেমন ব্রাদার, সমুদ্রের জল যারা বাড়াবার, তারা ঠিকই বাড়িয়ে চলবে। আমার তু'ঘটিতে আর কী এসে যাবে ? তোদের ওই 'সুখী পরিবার' গড়তে গড়তে আর পরিবারই খুঁজে পাবি না। পরবর্তী জেনারেশনের আর কোন আত্মীয়ই থাকবে না। এই তো মার এক পুত্র হয়ে আমার শালা কিছু নেই। না একটা দাদা দিদি, না তুটো ভাইপো ভাইঝি, ভাগ্নে ভাগ্নী। আত্মীয় যা কিছু সবই গিন্নীর দিকের। রথীন হতভাগার

কেউ না। থাকার মধ্যে একটা মানুষের মত মামা ছিল, তা তখন বোধবুদ্ধির অভাবে তাকে ঢের জ্বালিয়েছি, তারপর ব্যস, ভোঁ ভাঁ।

আবার ছ্যাবলা ছ্যাবলা হাসি হেসে বলল, নিজের চেষ্টাতেই তাই কিছু আত্মীয় বাড়াচ্ছি।

কৌশিক যদিও আজ বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক, তবু রথীনের আত্মপক্ষ সমর্থনের এই অদ্ভুত যুক্তি দেখে হাড় জ্বলে যাচ্ছিল তার। আবার এরই মাঝখানে কেমন একটু অপরাধবোধও পীড়া দিচ্ছিল। ও যখন বলল, 'মামা যেতেই সব ভোঁ ভাঁ' তখন কি কৌশিক বলে উঠতে পারল, 'মামার ছেলেটা তো রয়েছে। সেটাকে অবশ্য ভাইই বলে!'

না, এরকম কথা বলার সাহসই নেই, ভাবতেও পারবে না। এই হতভাগা চেহারার লোকটাকে কৌশিক বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বউকে বলতে পারবে, এই যে, আমার সেই ভাই, রথীন, যার সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। যত ভাব তত আড়ি। উঃ, কম জ্বালান জ্বালিয়েছে এটা আমায়। আর ছেলেকে বলতে পারবে, এই যে টুবাই, তোমার কাকা, নাকি জ্যাঠা? মতবিরোধ আছে। শুনতে পাই নাকি একই দিনে জন্ম, ওর বাড়িতে ও, আমার বাড়িতে আমি। কে আগে কে পরে সে তর্ক থেমে গেছে। যাক, কাকা-জ্যাঠার ভেদ ঘুচিয়ে বলতে পার আঙ্কল, প্রণাম কর। সর্বনাশ! কবি কল্পনাতেও এহেন সাহস সম্ভব নয়। কৌশিকের নিজেরই কি বলতে ভাল লাগবে, নিচের তলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটায় যে বড় চৌকিটা পড়ে আছে, ওইটায় এ আর আমি শুতাম, বুঝলি? এটার একটা বদ অভ্যেস ছিল, ওর যা কিছু সম্পত্তি, সব বিছানার তলায় গুঁজে রাখবে। লাট্টু থেকে লাটাই পর্যন্ত। বোঝ আমার অবস্থা! রাগ করলে দাঁত বার করে হাসত। তবে দাঁতগুলো ছিল সুন্দর। বললে বিশ্বাস করবি না, এর রংটা না দারুণ ফর্সা ছিল। ঠিক পিসিমার মত। আমি ওর কাছে কালো ছিলাম। লোক দেখে বলত, 'যেন কানাই বলাই'। আর এখন? স্রেফ পুরনো তামা।

বলতে পারবে এসব কৌশিক?

অসম্ভব, অসম্ভব।

আচ্ছা এই সব বলতে পারলেই কি কৌশিক গাঙ্গুলীর জীবনের মানেটা থাকত?

রথীন হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে বলল আচ্ছা, কই তোকে একটু চা-টা দিলে না তো? বলে এলাম। তুই কে, কি নিধি তাও জানিয়ে এসেছি।

আমি 'কে' সেটা বুঝলাম, কিন্তু 'কি নিধি' জিনিসটা কী?

ও বাবা, নিধি নয়? যাকে বলে রাজ অতিথি। এই অনির্বাণ, তোর মা কি চা বানাতে বুড়ো হয়ে গেল?

ছেলের নাম অনির্বাণ?

হ্যাঁ, বড়টা অনির্বাণ, মেজটা তথাগত, ছোটটা মানে এখনকার মত 'ছোট' হোমাগ্নি। মেয়েরা যাজ্ঞসেনী আর সংঘামিত্রা।

নামগুলো তো চমৎকার।

রথীন বলল, হ্যাঁ, আর কিছু তো দিয়ে যেতে পারবে না বাপু, তবু নাম কটা ভদ্রলোকের মত থাক। কারুর কোন ডাকনাম রাখতে দিইনি, পুরোনামে ডাকি।

ওরে বাবা! এই সব শক্ত শক্ত নাম।

হুঁ। বউও তাই বলে। বলে আদরের নাম একটা থাকবে না?

আমি বলি, আদর মানে তো তোমাদের সেই পান্তি, পুটুস, বাবাই, ফুটাই। থাক আর আদরে কাজ নেই। কালে ভবিষ্যতে কেউ যদি মানুষ হয়, নামটা থাকল মানুষের মত। বাপ ব্যাটার রুচির পরিচয় থাকল।

বিচিত্র।

যে লোকটা বসবার ঘরের দেওয়ালে দড়ি টাঙিয়ে লুঙ্গি গামছা শুকোতে দেয়, নিজে একটা কারখানার কুলির মত ডোরাকাটা পায়জামা আর হাফ হাতা শার্ট পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখ জুবড়ে ডাব খায়, হাঁড়ি চড়ে না; তবু নির্দ্বিধায় খাবার মুখ বাড়িয়ে চলে, সে ছেলে-মেয়েদের

নামকরণের সময় এত সব ভেবেছে। তার মানে—ওর সন্তানদের জন্যে ও 'সুন্দর জীবনের' স্বপ্ন দেখে।

কৌশিক! কৌশিকের তো স্বপ্ন দেখার কোনো খাঁজ নেই। এবং স্বপ্ন দেখার দায়ও নেই। ও জানে, যা হবে উৎপলার স্বপ্নে। যা করবার উৎপলাই করবে।

রথীন আর একবার হাঁক পাড়ল, এই, তোদের মা কি চায়ের জল চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কৌশিক এখন বলে উঠল, এই, তুই শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিস, আমার এখন চায়ের এমন কিছু দরকার নেই।

বলল। পরিস্থিতি দেখে।

যদিও দরকার ছিল একটু আগে।

তোর নেই আমার আছে. রথীন একটু গাঢ় হল। বলল, আমার বাড়িতে তুই, আমার এই ভাঙা মোড়ায় এসে বসেছিস, এ তো স্বপ্ন দেখছি। সেই তুই আমার বাড়িতে এসে অমনি মুখে চলে গেছিস, একটু চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি, এ দুঃখ সারাজীবনেও যাবে না রে।

কৌশিক খুব অস্বস্তি বোধ করে।

অথচ কী বলবে বুঝতেও পারে না। কোনমতে বলে, ধ্যাৎ, তুই এমন করছিস—

যা সত্যি তাই বলছি।

রথীন আরো গাঢ় হল। জানি আমার বাড়ির চা তোর অখাদ্য লাগবে। আমার বাড়ির কাপ-ডিশ তোর ছুঁতে ঘেন্না করবে, তবু এও জানি, সে কথা বউয়ের কাছে হেসে হেসে গল্প করবিনা। নাঃ, দেখতে হচ্ছে গিয়ে—

উঠে গেল চঞ্চল হয়ে।

একটু পরে নিজ মূর্তিতে দাঁত বার করে ফিরে এল, যা ভেবেছি তাই, একটা কিছু হয়েছে। আমার কারখানার দৌলতে বাড়িতে কেরোসিন স্টোভ আছে গোটা কতক, কিন্তু হঠাৎ নাকি কেরোসিন বাড়ন্ত। কাগজ-ফাগজ জ্বেলে উনুন ধরাতে গিয়েছিল, ধরেনি, নিভে

গেছে, এখন পাশের বাড়ির হীটার থেকে জল গরম করতে গেছে।

কৌশিক যেন মরমে মরে।

বলে, ছি ছি, শুধু শুধু বেচারিকে কত কষ্ট দেওয়া হল।

রাতদিন কষ্ট করছে, তোর জন্যে একটু করতে পেরে তো ধন্যই হল। এই বাড়তি কষ্টটা তো ভাগ্যফল। তবে পড়শীর কাছে গল্প তো করতে পারবে, বাড়িতে কেমন একখানা অতিথি এসেছিল।

কৌশিক ওর মুখের দিকে তাকাল। লোকটার মধ্যে একটা অহঙ্কার ভাবও আছে। নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে রীতিমত আস্থাও আছে। তবু তারও মধ্যে কেন এমন বিগলিত ভাব?

এটা কী? শুধুই ভালবাসা? বাল্যস্মৃতির আবেগ?

না কি অবচেতনে সেই উঁচুতলা নিচুতলা ভেদ?

এখন কৌশিক বলতে সক্ষম হল, লোকটা তো তার মামাতো ভাই!

রথীন একটু মাথা চুলকোলো, সেটা যদি স্বীকার করিস তোর মহত্ত্ব! আমিও অবশ্য সেই সাহসেই রাস্তা থেকে ধরে আনতে পারলাম। তবে এমন সাড়ে তিন হাজারি মামাতো ভাইই বা ক'জনের বাড়িতে আসে এ তল্লাটে? সাড়ে তিন হাজার মাস মাইনে, বছর বছর সপরিবারে ভারত ভ্রমণে প্লেন ভাড়া হোটেল খরচা--

কী আশ্চর্য! এত খবর পাচ্ছিস কোথা থেকে?

রাখিরে ভাই। না রেখে পারিনা। এখনো ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে গেলে এলে—'আমাদের বাড়ী' 'আমাদের বাড়ি' ভাব আসে।

সামনে দিয়ে যাস?

তা যাই-টাই মাঝে মধ্যে। দরজাটা দেখে মনটা তোলপাড় করে ওঠে। ঢুকে পড়তে পারি না। একটা অকাল কুষ্মাণ্ড বৈ তো নয়? এ শালা যে মাথা ঠাণ্ডা করে কখনো দাসত্ব-ফাসত্ব করতে পারল না, যদি বা জুটেছে কখনো, মাথা গরম করে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। শেষ অবধি এই টিনের উনুনের কারবার।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, জানালা দিয়ে একটু স্নিগ্ধ হাওয়া আসছে। কৌশিক ওই বাইরেটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল. আস্তে বলল, আচ্ছা

রথীন, ধর যদি শুনিস আমার ওই সাড়ে তিন হাজারিটা কাল থেকে আর নেই, খতম! তখন?

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা।'

রথীন স্রেফ তার মায়ের ভঙ্গিতে কপালে জোড় কর ঠেকিয়ে বলে উঠল, দুগ্‌গা দুগ্‌গা! ঠাট্টা করেও অমন অপয়া কথা মুখে আনতে নেই রে। গ্রহরা নাকি অলক্ষ্যে বসে থাকে।

তুই এসব মানিস?

হতভাগারা সবই মানে ভাই, ভূত ভগবান, হাঁচি টিকটিকি, শনি, মঙ্গল, সব। আসলে কী জানিস—

আসলে কি সেটা আর শোনা হয়না কৌশিকের। রথীনের বউ এসে ঘরে ঢোকে। হাতে একটা থালার ওপর বসিয়ে এনেছে দু পেয়ালা চা, আর দুটো প্লেটে দুটো করে রসগোল্লা, আর দুখানা করে নিমকি।

তাও ভাল।

'বাড়ির খাবার' বলে যে রেশনের সুজি দিয়ে হালুয়া করতে বসেনি এই মঙ্গল।

কৌশিক হাত তুলে নমস্কার করে বলল, আপনাকে খুব খাটালাম।

মহিলা খুবই অপ্রতিভভাবে বলল, ইস্‌, না না। বরং আপনারই—

থালা সামনে চৌকীর ওপর নামিয়ে দিয়ে আঁচলের কোণটা তুলে কপালের ঘামটা মুছল।

কৌশিকের মনে পড়ল না একে কোনদিন দেখেছে। হয়তো দেখে থাকতেও পারে। এমনই সাধারণ অনুজ্জ্বল চেহারা যে মনে থাকবারও নয়।

রংজ্বলা একটা নীল ব্লাউজের সঙ্গে হালকা নীলচে একটা ছাপা শাড়ি পরা, তাও সোজা করে। হয়তো বাড়ির বাইরে বেরোতে হলে স্বাভাবিক আধুনিক ধরনের ভঙ্গিতেই আছে। কে জানে এইটাই তার সব থেকে ভাল শাড়ি।

কৌশিকের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল।

একটা আলমারির চাবি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুপঝাপ গোটা কতক পাটকরা অথবা নতুন শাড়ি পড়ে গেল মাটিতে।

তার সঙ্গে একটা অসহিষ্ণু স্বর, 'অসম্ভব, এইভাবে চালানো যায় না! সামনের মাসেই একটা আলমারির ব্যবস্থা করছি।'

আপনার ছেলেমেয়েদের শুধু নামই শুনলাম, দেখলাম না!

রথীনের বউ খুব বিষণ্ণ মুখে একবার বরের মুখের দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল, স্কুল থেকে এসেছে তো ইয়ে, খাবার খাচ্ছে।

সবাই স্কুলে যায়?

বউ হেসে ফেলল।

কৌশিকের মনে হল হাসিটায় সারল্য আছে। এই সময় রথীন বলল, তুমি আর চাপলে কী হবে, আমি আসল কথাটি ফাঁস করে দিয়েছি।

হঠাৎ যেন ফস্ করে দুটো দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল।

দেয়াল ধার থেকে রথীনের লুঙ্গিটা আর গামছাটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। বলতেই হবে যথেষ্ট সৌষ্ঠবজ্ঞান আছে। রাগ দেখিয়ে ফস্ করে চলে গেল না।

কৌশিকের ধারণায় যেটা স্বাভাবিক।

কৌশিক ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, এভাবে কথা বললি কেন?

রথীন তার সেই পেটেন্ট হাসিটা হাসল, রাগলে ওকে দেখায় ভাল, তাই যখন তখন—

॥ সাত ॥

ফেরার সময় রথীন আবার সঙ্গে সঙ্গে এল, তরুদির কাছে যাচ্ছিস তো? চল বাস পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

তারপর আরো কত কি বলতে বলতে চলল। নেহাৎ কৌশিক বলেই তাই বাসের প্রশ্ন, রথীন তো এ টুকুর জন্যে বাসের কথা ভাবতেই না। দুটো তো মাত্র স্টপেজ! উঃ, আজ কি আহ্লাদ যে হচ্ছে।

কৌশিকের বরং মনে হচ্ছে এই ডোরাকাটা পায়জামা আর হাফ্-শার্টের পাশ এড়িয়ে বাসে উঠতে পারলে বাঁচি। অথচ যতক্ষণ না

উঠতে পাচ্ছে, কথা তো কিছু বলতেই হয়। বলল, তুই যাস দিদির বাড়ি ?

রথীন লজ্জিতভাবে বলল, না ভাই, এখনো যাই নি। ইচ্ছে করে, কিন্তু গেলেই হয়তো তরুদি সৌজন্যের দায়ে বলবে, একা এলি ? বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে আবার আসিস একদিন। হয়তো বা খেতেই বলবে। জানি তো তরুদিকে।

বলল তো কী ?

নাঃ ! ঠিক করেছি একটু দাঁড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত—কারো বাড়ি-কাড়িতে—

এতক্ষণে কৌশিক প্রশ্ন করল, তোর কারখানাটা কিসের ?

আমার কারখানা ? আমারই জাতের। হা হা হা ! কেরোসিন স্টোভের। তবে আজকাল জিনিসটার ডিমাণ্ড আছে। যতসব ছবি-ছবি ফ্ল্যাটের সুখী-সুখী পরিবার, কয়লার উনুন জ্বালার তো উপায় নেই ! আর সবাই কিছু গ্যাসের উনুন পাচ্ছে না। তাছাড়া আমি নিজে একটা 'পেটেন্ট' করে ফেলেছি—তেলের নিচে এক লেয়ার জল থাকে, তার ওপর মিহি একটা জালি পাতা। এতে কী হয় জানিস, তেল ফুরোলেও পলতেটা পুড়ে যায় না।

কৌশিক হাসল, বলল, তেলে জলে মেশে ?

রথীনও হাসল, অভিজাত তেলেরা মেশে না, কেরোসিন মেশে।

জ্বলতে অসুবিধা হয় না ?

না না।

কিন্তু তেলটা তো ফুরোয় ?

রথীন বলল, তা অবশ্যই। তবে পলতেটা ঠিক থাকে, সেটাই লাভ। আশা করছি শীগগিরই দাঁড়িয়ে যেতে পারব।

বাস এসে যাচ্ছে।

কৌশিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আচ্ছা, রথীন, তখন কি তাহলে তুই জীবনের মানে খুঁজে পাবি ?

ও, সিওর। রথীন খুব নিশ্চিত গলায় বলল, সমস্যাটা তো শুধু মাত্র পয়সার। ওটার একটু সমাধান হলেই—

বাস এসে গেল, উঠে পড়ল কৌশিক।

॥ আট ॥

বাসে উঠে কৌশিকের মনে হল, আশ্চর্য! এই লোকটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে তার কেরোসিন স্টোভের কারখানাটা একটু জাঁকিয়ে উঠলেই সে তার জীবনের মানে খুঁজে পাবে। বলল, সমস্যা তো একটাই, পয়সার অভাব। যেটা মিটলেই—

কৌশিকের জীবনে তো সে সমস্যাটা একেবারে 'নেই' বলা চলে না, তবে তেমন তীব্র নেই। যদিও নিজের একটা গাড়ি না থাকাটাই উৎপলা রীতিমত দৈন্যদশা বলেই মনে করে।...অফিসের শেয়ার গাড়িতে চারজনে অফিস যাওয়া আসা, এ আবার একটা গৌরবের ব্যাপার নাকি?

অথচ টুবাইকে তো 'উচ্চশিক্ষার' জন্যে বিদেশ পাঠাতেই হবে। তার জন্যে এখন থেকেই টাকা জমানোর কথা ভাবতে হচ্ছে উৎপলাকে। ছেলেটার মাত্র আট বছর বয়েস! তাতে কী? আঠারো হয়ে উঠতে ক'-দিন?

কৌশিক একদিন বলে ফেলেছিল, বিদেশে পাঠাতেই হবে এমন কি অমোঘ আইন?

উৎপলা বলেছিল, যা বোঝোনা তা তা নিয়ে তর্ক করতে এসো না। তোমার যদি 'বাইরের ছাপ' থাকত, তুমি ডিরেক্টরদের একজন হয়ে যেতে পারতে, সেটা ভেবে দেখেছ কোনদিন? তোমার বাবা ইচ্ছে করলে পারতেন।....তা নয় একজনের জায়গায় তিনজনকে পুষে— দান দাতব্য করে—

হ্যাঁ, এসব কথা হয় মাঝে মধ্যে—

তা সত্ত্বেও, কৌশিকের সংসারকে তো মোটামুটি সচ্ছলই বলা চলে? অন্য আর কী সমস্যাই বা আছে?

ভেবে পেলনা কৌশিক।

অথচ জীবনের কোনো মানে খুঁজে না পেয়ে সে তার সাড়ে তিন হাজার টাকার চাকরিটায় আজ ইস্তফা-পত্র দিয়ে এল। ··

কী করব! হঠাৎ যে আমার ভীষণ অসহ্য লাগল। আবার কাল থেকে ওই গাড়ি চড়ে ওই লোকগুলোর সঙ্গে গল্প করতে করতে সেই পরিচিত গেটটা পার হয়ে লিফ্‌টে চড়ে সুট করে উঠে গিয়ে সেই পরিচিত চেয়ার টেবিলটায় গিয়ে বসতে হবে, এ আমি আর ভাবতে পারলাম না।

এর জন্যে সবাই আমায় ছি ছি করবে?

কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে?

আমি যদি ওদের হাত থেকে পালাই? হ্যাঁ, পালানো ছাড়া ওদের হাত থেকে ছাড়ান পাবার উপায় কি?

আচ্ছা, আমার বাবা কি কোনো দিন ভেবেছেন, জীবনের মানে আছে কি না?

মাকে তো আমার মনেই পড়ে না, শুধু বাবা।

বাবার মুখে কী প্রশান্তি ছিল।

বাবা যখন সকালে স্নানের পর ঠাকুরঘরে বসে গীতা পাঠ করতেন, তখনো যেমন প্রসন্ন প্রশান্তি, যখন রোদে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি খাটাতেন, মুখে ঠিক তেমনিই প্রশান্তি।

বাবার ভাগ্নে যখন পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে এসে বলল, 'আমার দ্বারা হবে না', বাবার বোন কপালে হাত চাপড়ে কাঁদতে লাগল, 'এই আমার পোড়া কপালের দোষেই ওর ওই দুর্মতি', তখনও বাবা ঠিক তেমনিভাবেই বললেন, 'পাগলামী করিস না সুধা, কারুর কপালে কারুর কিছু হয় না, যার যার নিজের নিজের কপালে যা হবার হয়।'

আচ্ছা, ঠাকুরঘরের সেই ঠাকুর-টাকুরগুলো কী হল? সেগুলো গেল কোথায়? ঘরটাতে তো বাড়ির যত পুরনো অপ্রিয়দর্শন জিনিসগুলো ঢোকানো আছে মনে হয়।

এ কী মামাবাবু, আপনি এখানে? বাসে? কোথায় যাচ্ছেন?

চমকে তাকাল কৌশিক।

ছেলেটাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

অথচ মনে পড়ছে না।

ছেলেটা কাছে এগিয়ে এল। চিনতে পারছেন না, আমি গোবিন্দ।....

মনে পড়ল। জামাইবাবুর কী রকম যেন ভাইপো হয়। কাছা-কাছি থাকে। দিদিদের বাড়িটা কতো সাবেকি, তবে এখন ভাগ-টাগ। এ ছেলেটা দিদির জ্ঞাতিদের। সব সময় আসে, দায় দায়, সেই সূত্রেই—

জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ির স্টপেজ কিন্তু ছেড়ে এসেছেন মামাবাবু!

আরে তাই নাকি?

শালখের মাটিতে নামতেই হল কৌশিককে। অথচ ভাবেনি আর নামবে।

আর এই সময় আর একবার ভাবল কৌশিক, আশ্চর্য, আমি যখন পৌনে দুটোর সময় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম, আমি কি তখন এই-খানে আসব ভেবেছিলাম?

তাহলে?

আমার কি পালিয়ে যাবার আগে একবার দিদিকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল? একেবারে অবচেতনে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো পালিয়েই যাচ্ছিলাম।

রেজিগ্‌নেশনে লেটারটা লিখে পাঠিয়ে দেবার পরই তো আমি সরে পড়ছিলাম। আমি ভাবিনি কোথায় যাব। শুধু মনে হয়েছে পালাতে হবে। একটা মানেহীন জীবনের বোঝা বয়ে বয়ে কতকগুলো মানেহীন কথার তালে তাল দিয়ে দিয়ে খুব ভাল লাগার মুখ নিয়ে কাটিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

আচ্ছা, হঠাৎ আজকেই বা আমার পালাবার ইচ্ছে করল কেন? এমন আকস্মিক!

নাকি ইচ্ছেটা তিল তিল করে সঞ্চিত হচ্ছিল, আমি টের পাইনি। যেই টের পেলাম—

॥ নয় ॥

দিদি অবাক হয়ে বলল, একা যে? অফিস ফেরৎ বুঝি?

কৌশিক কিছু বলার আগে জামাইবাবু বললেন, আচ্ছা, ভাই এল, তাকে স্নেহ সম্ভাষণ না করেই জেরা? একা কেন, কোথা থেকে এলি?

আচ্ছা থামো, আমার ভাইকে স্নেহ করার কথা তোমার কাছে শিখতে হবে নাকি?

তোমার ভাই ঠিকই, তবে হতভাগ্য পুরুষ জাতির একজন তো? সেই হিসেবে আমার স্বজাতি, আর সেই হিসেবেই—

তোমার হিসেব থামাও। প্রত্যেকবার ছেলের জন্মদিনে দু'জনে আসে নেমন্তন্ন করতে—

ছেলের জন্মদিন!

কৌশিক যেন অজানা লোকের ভাষা শুনল।

টুবাইয়ের জন্মদিন!

কবে যেন? সাতাশে জুন না? আজ? আজ বাইশে জুন। আজই ঘণ্টা কয়েক আগে কৌশিক অফিসের টেবিলে যে চিঠির কপিটা চাপা দিয়ে রেখে এসেছে, এবং মূলটা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাতে তো এই তারিখটাই বসিয়েছিল। বাইশে জুন।

কৌশিক বলল, আমি নেমন্তন্ন টন্ন করতে আসিনি. এমনি চলে এলাম।

দিদি খুব প্রীত হল।

বলল, আয় বোস। কী খাবি বল?

যা খাওয়াবে।

কৌশিকের গলার কাছে এখনো রথীনের বাড়ির চায়ের তেতো তেতো স্বাদের আভাস। বলল, আগে তো চা খাব, তারপর যা দেবে।

দিদি একটু হাসল, আজতো বউ সঙ্গে নেই, তোকে একটু গেরস্থালী জিনিস খাওয়াই—ছেলেবেলায় খুব ভালবাসতিস—

দিদি চটপট কিছু বেগুনী ভেজে নিয়ে এল, আর একবাটি মুড়ি মেখে নিয়ে এল তেল নুন দিয়ে। একটা কৌটো থেকে নিজের তৈরি 'ঝালমশলা' বার করে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এই দেখ 'ঝালমুড়ি' হয়ে গেল। ছোটবেলায় ভীষণ ভালবাসতিস না?

আর নিজে?

দিদির মুখ হাসিতে ভরে গেল। –সে কথা আর ফাঁস করে বসিস না।

জামাইবাবুকে দিলে না?

ও তো এইমাত্র খেয়েছে!

কী খেয়েছি? ঝালমুড়ি? আমায় কতকগুলো বাজে মাল দিয়ে—

লুচি আলু চচ্চড়িটা বুঝি বাজে মাল?

নিশ্চয়। ছাড়ো এদিকে কিছু।

রাত্তিরে রুটি কম খেতে পাবেনা বলে দিচ্ছি।

জামাইবাবু একগাল মুড়ি মুখে পুরে বলে উঠলেন, এই জিনিসের কাছে লুচি আলুচচ্চড়ি! হুঁঃ। ফ্যাশানের খাতিরে কিনা এই জিনিসটা থেকে বঞ্চিত থাকে।

কে বলল বঞ্চিত থাকে? দিদি বলে উঠল, বিকেল বেলা মোড়ের মাথায় ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে দেখো। ঝালমুড়িওলা আর ফুচকা-ওলাকে ঘিরে যারা হুল্লোড় করে, তারা কারা? যার যত ফ্যাশান, সে তত আদেখলে হয়ে যায়। ওটাই ফ্যাশান।

দিদির ছেলে নেই, শুধুই দুই মেয়ে, দিদি তাদের সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বসে আছে; দুজনেই দূরে থাকে। বাড়িতে এই দুটো মাঝবয়সী মানুষ, তবু দিদির বাড়িতে সর্বদা হালকা হাসিখুশির হাওয়া।

কৌশিকের বাড়িতেই কি হাসিখুশির হাওয়া নেই? অবশ্যই আছে। এই তো টুবাইয়ের জন্মদিনে হাসির বন্যা বইবে। এমনিও বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব বিশেষ আত্মীয় টাত্মীয় এলেই হাসি আহ্লাদের ঝর্নাধারা। তবে? তবে কৌশিক এই বাড়ির হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বর্তে যাচ্ছে কেন? আজই যাচ্ছে অবশ্য। অন্যদিন তো নিজেকে দেখতে পায়না কৌশিক নামের লোকটা।

যাকে দেখে তার তুতো ভাই তার দিকে সমীহর দৃষ্টিতে তাকায়, বাড়ি গিয়েছে বলে কৃতার্থ।

ওই পর্যায় থেকে নেমে আসবার উপায় থাকে না।

॥ দশ ॥

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে কৌশিক দিদিকে সংক্ষেপে রথীনের কাহিনীটা বলল।

তরু অবাক হল, হ্যাঁরে এত কাছে এসে এতদিন রয়েছে, একবার দেখা করেনি? কবে বড়লোক হবে বলে বসে আছে? ঠিকানাটা বল তো আমায়।

ঠিকানা জানিনা, টেনে নিয়ে গেল।

আ া সে আমি বার করে ফেলেছি। ছাখো কাণ্ড! এই তুমি কাল একবার খুঁজে দেখবে, দেখা হলে বলবে, সামনের রবিবারে যেন তুপুরে সবাই এখানে খায়।

এই সেরেছে। এই ভয়েই সে এখন অজ্ঞাতবাস করতে চায়। তার অবস্থা না ফিরলে কারো বাড়িতে—

আচ্ছা সে আমি বুঝব। ওমা! আমাদের রথীন এখানে রয়েছে —যোগাযোগ তো নেই, রাখতেও পারিনা—

এই সময় কৌশিক বিনা ভূমিকায় বলে উঠল, আচ্ছা জামাইবাবু, একটা কথা সত্যি—মানে ঠিক বলবেন?

জামাইবাবুর তৎক্ষণাৎ উত্তর, হঠাৎ এমন সন্দেহ কেন হে শালা? কখনো তো সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিনা—

না না, তা নয়। সন্দেহ নয়, এমনি জিগ্যেস করছি, আপনার কখনো কোনোদিন মনে হয়েছে, 'জীবনটার কোনো মানে নেই!'

মুহূর্তে উত্তর, কখনো? কোনোদিন? সদা সর্বদা, উদয়াস্তই মনে হচ্ছে—

সবসময় মনে হয়?

হয়ই তো। কেবল মাত্তর তোর দিদিকে সধবা রাখা ছাড়া আর তো কোনো মানে খুঁজে পাই না।

দেখো, ভাল হবেনা বলছি—

ভাল আবার কবে হচ্ছে? জোড় হস্তেই তো আছি। কিন্তু ব্রাদার ইন ল, তোমার মুখে হঠাৎ এমন দার্শনিক উক্তি কেন? গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করে আসোনি তো?

বালাই ষাট! দিদি বলে ওঠে, ঝগড়া করেই বা আসবে কেন? আমার ভাই কি তোমার মত ঝগড়াটে?

এই দিদি, কী বলছিস যা-তা?

যা-তা আবার কী। ওকেই জিগ্যেস কর না, যখন-তখন, নিকুচি করেছে সংসারে, এই চললাম, আর ফিরছিনা—বলে বেরিয়ে যায় কি না?

যাই তার কী? তারপর? একটু পরেই ফিরে আসিনা গরম জিলিপির কিংবা গরম হিঙের কচুরীর ঠোঙা হাতে নিয়ে?

কৌশিক তার চিরপরিচিত এই মুখদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখে যেন অবাক হয়। জীবনটাকে এমন সহজ করে নিতে পারলেই কি জীবনের মানে খুঁজে পাওয়া যায়? কিন্তু সহজ করে নেওয়াটা কি নিজের হাতে?

ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন, তুমি শালা শহরের মাঝখানে বাপের রেখে যাওয়া একখানা মানুষের মতন বাড়ির একমাত্র অধিকারী, হাজার চারেক টাকার চাকরি আরো উন্নতির সম্ভাবনা, ঘরে প্রেমময়ী পত্নী, সোনার চাঁদ ছেলে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবার দুশ্চিন্তা নেই, মানে তোমাদের তো আর ওই একটা ভিন্ন দুটো হবে না, তুমি যদি আচমকা জীবনের মানে খুঁজতে বসো, আমরা কী করব? এই আমরা যারা কোনমতে দুটো খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে থাকতে পারলেই বর্তে যাই। খাই দাই বাজার করি আড্ডা দিই, সস্তা দুটো রাজনীতির বুলি বসে আসর জমাই, শাসকদলকে নিন্দে করি, দেশের দুর্নীতি নিয়ে আক্ষেপ করি, খবরের কাগজের খবরে জগৎ দেখি, এবং শেষ লক্ষ্য রাখি বউকে সধবা রাখার,—তারা?

আপনি আমার কথাটা ধরতেই পারলেন না, কৌশিক বলল, আমি বলছি! এই দিনের পর দিন দিন-রাত্রির ঋণ শোধ করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই কি জীবন?

জামাইবাবু একটু গম্ভীর হলেন, বললেন, অভাগা একটা মফস্বলী ইস্কুলের বাংলার মাস্টার। কীই বা বুঝি? তবে যারা আপন জন, যাদের ভালবাসি তারা সব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই ভগবানের জয় দিই।

আচ্ছা, ওই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই যদি কারুর কাছে অসহ্য লাগে?

দিদি গম্ভীর ভাবে বলে, তবে মাথার চিকিৎসা করতে হয়।.... নে ওঠ, রাত হয়ে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে বউকে বোধহয় জানিয়ে আসিসনি, সে বেচারী ভেবে মরছে।

কে বললে ভেবে মরছে।

ওঃ, বলে এসেছিস? তবু ভাল। তাহলেও রাত হয়ে যাচ্ছে, এসেছিস কিসে? অফিসের গাড়িতে?

অফিসের গাড়ি? নাঃ। কৌশিক বলল, মনে কর চাকরিতে রিজাইন দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

কী? কী করে এসেছিস? ঠাট্টার আর কথা পেলি না?

দিদি যখন উৎক্ষিপ্ত, তখনই হঠাৎ একটা ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল, মেজ জ্যেঠিমা, তোমাদের ফোন।

এই দেখো কাণ্ড! নিশ্চয় এই ছেলেটা কিছু একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে এসেছে—

জামাইবাবু কাছা আঁটতে আঁটতে এগোতে এগোতে বললেন, কোথা থেকে ফোন কিছু বলেছে?

বলেছে, রামময় রোড থেকে বলছি বললেই বুঝতে পারবেন।

হুঁঃ। পেরেছি বুঝতে। ছুটে বেরিয়ে যান ভদ্রলোক। জ্ঞাতি ভাইয়ের বাড়ির টেলিফোন, তবে সম্প্রীতি রাখার গুণে সেটা কাজে লাগে।

॥ এগারো ॥

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে। যা বলেছি তাই। শালাবাবু বাড়িতে কিছু না জানিয়ে অফিসে কী একটা কাণ্ড করে বেলা দুটোর সময় বেরিয়ে পড়েছেন, এখন বউটার কী জ্বালা।

না না কৌশিক ভেরি ব্যাড। অফিস থেকে নাকি কারা সব বার বার বাড়িতে ফোন করছে। বউয়ের এখন খেয়াল হয়েছে—হয়তো এখানে আসতে পারে। তাই—যা—না, কপালে আজ কী আছে দেখগে যা।....আচ্ছা তুই তো আর অফিসের ক্যাশ ভাঙিসনি, অফিসেই যদি কারো সঙ্গে কিছু হয়ে থাকে, বাড়ি ফিরতে কী? চলে যা এক্ষুনি ট্যাক্সিতে।···তুই এখানেই এসেছিস শুনে তোর বউ তো পারে টেলিফোন লাইনের মধ্যেই আমাকে তু঱্ঘা দিয়ে দেয়। কী রে এস্কর্ট করে যাব নাকি তোর সঙ্গে?

দিদি বলল, ন্যাকামি কোরো না। তোমার সামনে ছেলেটা তুলো ধোনাই হোক্ এই চাও?

আহা ধোনাইটা সমে আনতেই—

থাক্, তুমি বরং একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দাওগে। এই কৌশিক, এখন বউ রাগে দুঃখে অভিমানে যা মুখে আসবে বলবে, চুপ করে থাকবি।

কৌশিক নিজের দোষ স্বীকার করল না। শুধু বলল, চুপ করেই তো থাকি।

তারপর রাস্তায় নেমে পড়ে জামাইবাবুর ডেকে আনা ট্যাক্সিটায় চেপে বসে 'টা টা' করার মত হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

॥ বারো ॥

কিন্তু তারপর?

ট্যাক্সিটা রামময় রোডের সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই মারমুখী হয়ে ছুটে এল বাড়ির অধিকর্ত্রী? লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে যা মুখে এল বলতে শুরু করল? জ্বলন্ত লাভাস্রোতের মত যা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারে তেমন সব জ্বলন্ত ভাষা দিয়ে?

নাকি নিজেই সে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে যন্ত্রের মত প্রশ্ন করল, ছুটোর সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে? একবার জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল না? অফিসে নাকি উন্মাদের মত একটা চিঠি দিয়েছ? তারপর কোথায় গিয়েছিলে? মেন্টাল হসপিটালে? সেখানে

যাওটাই তো জরুরি ছিল। করতেও হবে তাই। বাধ্য হয়েই আমাকে আজ তোমার ওই চৌধুরী না চ্যাটার্জি, তাকে বলতে হল আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি একজন সাইকোলজিস্টকে দেখানো দরকার। ক'দিন ধরেই দেখেছি কেমন যেন—এছাড়া মান বাঁচাবার উপায় কী ছিল?

আর সেই 'সোনার চাঁদ' ছেলেটি!

বরাবর বাবাকে যে মার বিরোধী পক্ষ বলে সন্দেহের চোখে দেখে থাকে এবং সর্বদা মাকে শেল্‌টার দেবার চেষ্টা করে, সে তার হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রুষ্ট ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার মাতৃনিপীড়ক, শান্তি হন্তারক, অন্যায়কারী আসামীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার জেল হওয়া উচিত। তোমার জন্যেই হয়তো মাকে একদিন সুইসাইড্‌ করতে হবে।

নিঃসঙ্গ শিশু, তার ওপর তো অন্য আর কোনো আলো ছায়া এসে পড়েনি, যে ছায়ার নিচে বর্ধিত হচ্ছে সেটাতেই আচ্ছন্ন। যা শোনে সেইটাই মুখস্থ করে।

হ্যাঁ— এই দুইয়ের একটা হতে পারত।

কিংবা 'অসম্ভব' গোছের হলেও এমনও ভাবা যেতে পারত, এতক্ষণ ধরে স্নায়ুর ওপর এত চাপ পড়ায়, মহিলা আদি অন্তকালের নারীজাতির মত কেঁদে ফেললেন।

কিন্তু এই সব 'হলেও হতে পারত' ঘটনাগুলো ঘটল না। কারণ, ট্যাক্সিটা রামময় রোডের সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল না সেই বাইশে জুনের রাত্রে!

॥ তেরো ॥

ট্যাক্সি-ড্রাইভার চোখ কুঁচকে বলল, হাওড়া স্টেশন? বললেন যে ভবানীপুর।

নাঃ এখানেই নামব। ভবানীপুরে যেতে আপনার মিটারে কত উঠত?

সে কথায় কী হবে? যা উঠেছে দিয়ে দিন।

না না বলুন, ওটা দিয়ে দিচ্ছি—

কৌশিক মিটার বক্সে একটা নজর ফেলে নিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে এক মুঠো নোট বার করে ন্যায্য পাওনার ওপর একটা দশ টাকার নোট রেখে বাড়িয়ে ধরে বলল, কিছু অন্তত নিন।

মাপ করবেন। যা হয়েছে দিয়ে দিন তাড়াতাড়ি।

লোকটা নির্লোভ কিন্তু অভদ্র।

অনায়াসে বাড়তি নোটটা ঠেলে দিয়ে মুখের সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। আবার বলে গেল কিনা 'আপনার টাকা বেশি থাকে তো গরিবকে দিয়ে দেবেন।'

কৌশিক একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাওড়া স্টেশনের জনারণ্যে মিশে গেল।

॥ চোদ্দ ॥

অরণ্যে একটা বাড়তি পাতা উড়ে এসে পড়ে গেলে আর কি তাকে আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায়?

অরণ্যে ঝড় ওঠে, শুকনো পাতা ঝরে পড়ে উড়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়।

তাদের ধাক্কায় ধাক্কায় সেই পাতাটা এই বিশাল বিশ্বে কোথায় ছিটকে চলে যায়।

অথচ এই বিশাল বিশ্বে হারিয়ে যাওয়া ওই পাতাখানা যাদের কাছে পরম প্রয়োজনীয়, তারা তো খুঁজেই বেড়াবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কত কত জন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, শিশু বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ যুবক যুবতী। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, আবার কোনোদিন ফিরে আসছে কি না, কে খোঁজ নিতে যাচ্ছে?

"নিখোঁজ নিরুদ্দেশ' ওটা খবরের কাগজের একটা খবর বৈ তো নয়।

তাই কিছুদিন ধরে যে কাগজে খবর বেরোতে লাগল, 'গত বাইশে

জুন···সন্ধ্যা হইতে পাওয়া যাইতেছে না—নাম কৌশিক গাঙ্গুলী, বয়স আটত্রিশ, লম্বায় ছ ফুট এক ইঞ্চি, মাঝারি রং, মাঝারি গড়ন, ডান ভুরুর উপর একটি তিল, পরনে হালকা বাদামি সার্ট, টাই, চোখে মূল্যবান চশমা, আঙ্‌লে ছুটি আংটি, হাতে দামী ঘড়ি। ...খুব সম্ভব সঙ্গে মূল্যবান ব্রীফকেস। একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই ব্যক্তিটির হঠাৎ ঈষৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায়···কেহ সন্ধান দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।'

তাই বা কে মন দিয়ে দেখল ?

কে লক্ষ্য করল সঙ্গে ছাপা ফটোটার দিকে ?

আশ্চর্য, দশ হাজার টাকার টোপটা কিছুই নয় ? এত নিঃস্ব দীন দরিদ্র বেকার, সমাজবিরোধী, সুযোগসন্ধানী লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারুর মনে হচ্ছে না দেখি না একবার খোঁজবার চেষ্ট করে ?

আর পুলিশ ?

লোকটা যদি অফিসের ক্যাশ ভেঙে পালাত, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত, পুলিশ স্বর্গ মর্ত পাতাল উটকে নিশ্চয় তাকে টেনে বার করে এনে আদালতের উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিত। না, একটা সৎলোক নিজে নিখোঁজ হয়ে গেছে ওর জন্যে মাথা ব্যথা নেই পুলিশের। কিডন্যাপের ব্যাপারও তো নয় ? ক্রোড়পতির কিশোর পুত্র নয় যে, ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করার উদ্দেশ্যে—না: এ একেবারে বাজে ব্যাপার। একটা বুদ্ধিমান মানুষের হঠাৎ বুদ্ধি বিকৃতি ঘটায় সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে গৃহগণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। দূর দূর।

ওই সব মস্তিষ্ক বিকৃতদের জন্যে পুলিশ মস্তিষ্ক খরচ করে না।

কিন্তু ও ছাড়া আর কী লেখা যেত ?

কৌশিক গাঙ্গুলী নামের লোকটা ধাঁ করে যে কাজটা করে বসল সেটা নিশ্চয়ই কোনো সহজ মস্তিকের কাজ নয়।

ওর স্ত্রীকে এই ভাষাটা ব্যবহারের জন্যে দোষ দেওয়া যায় না।

সে কী করে ধারণা করবে, তার হাতের মুঠোর মধ্যেকার একটা মানুষ যাকে সে আগাগোড়া পড়ে ফেলে, পড়াপুঁথির মত অনুৎসুক অবহেলায়

ফেলে রেখে দিয়েছিল, সে হঠাৎ তার হাত ফসকে 'জীবনের মানে না থাকার' হতাশায় মুহূর্তে রাজঐশ্বর্য ফেলে দিয়ে রাজপথে নেমে যাবে !

মাথা খারাপ হলেই লোকে এ রকম করে।

অফিসের চৌধুরীর সামনে লাল লাল মুখে কান্নাচাপা গলায় বলেছিল হারিয়ে যাওয়া লোকটার স্ত্রী, আপনারা তো শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে ছিলেন আপনারা কোন বৈলক্ষণ বুঝতে পারেন নি ?

উনি এবং ওঁর সঙ্গেরা দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বলা সঙ্গত কিনা। শুনলেই হয়তো মিসেস বলে বসবেন, 'একটু যদি দেখেছিলেনই তো তক্ষুনি ওর সম্পর্কে কেয়ার নেন নি কেন ?'

এত ফেরে যাবার দরকার কী ?

ওঁরা সমস্বরে বললেন, না না কিছু না। একেবারে স্বাভাবিক। হ্যাঁ যেমন কথা বলতে বলতে যাই, গেছি। যেমন কাজে বসেন বসে-ছেন। হঠাৎ শুনলাম একটা বেয়ারা বলছে, ছুটোর সময় বেরিয়ে গেছেন। ধরে নিলাম হঠাৎ কোনো দরকারে—

আমার অজানিত কোনো দরকার ওর থাকত না। ছিলও না। মিসেস বলেছিলেন দৃঢ় স্বরে—হঠাৎ মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েই --

॥ পনের ॥

লোকটা যদি অফিসে ওই চিঠিখানার ব্যাপার না ঘটিয়ে এমনি বেরিয়ে যেত তাহলে অবধারিতই ওকে 'নিহতের' সংখ্যায় ফেলা হত। এটা তো সচরাচরের ঘটনা। কোনদিন কোথাও একটা অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের গলিত শবকে কৌশিক গাঙ্গুলী বলেই ধরে নিয়ে হাহাকার করে ভগবানের অনেক মার মেনে নেওয়ার মত মেনে নেওয়া হত।

কিন্তু এ তো তা নয়।

এ তো বলে কয়ে, প্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে ইচ্ছাকৃত নিখোজ।

অথচ ইহ সংসারে এই ত্রিশ বছরের মহিলাটি এবং তার আট বছরের ছেলেটির থেকে অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি তো তার থাকতে পারে না ? ওরা কে এমন ?

অতএব তার স্ত্রী আপন বিশ্বাসেই লিখেছে 'ঈষৎ মস্তিষ্কবিকৃতি' তবু তো 'ঈষৎ' বলেছে। পরিচিত জনেরা তো বলছে 'পুরো উন্মাদ না হলে কেউ'—

ওর সেই কেরোসিন কুকারের কারবারী ভাইটি তো বলছেই, তখনি সন্দেহ হয়েছিল আমার। নচেৎ আমার বাড়িতে এসে আমার এই লক্ষ্মীছাড়া ঘরে বসে গল্প করে? চা খায়? —কী করবো। আমার যে আষ্টেপৃষ্ঠে নাগপাশ। না হলে ছুটে বেরিয়ে পড়ে খুঁজে বার করে ছাড়তাম। পালাবে কোথায়? বিলেত আমেরিকাতে তো আর গিয়ে পড়তে পারেনি? এই ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরলেই—ঘর পালানে লোকেদের এটাই তো আশ্রয়। গেলে হয়তো দেখতে পাব কোন একটা সাধুর আখড়া আড্ডায় বসে চ্যালাগিরি করছে। নয়তো গেরুয়া পরে পাগড়ী মাথায় দিয়ে সেবাশ্রম ফেবাশ্রমে লোকসেবা করছে। গেরুয়াই পরুক আর ভস্মই মাখুক আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কী করব পায়ে ছেকল বাঁধা! একটু উপায় থাকলে -বেরিয়ে পড়ে তাকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনতাম না?

ওর ওই প্রবল উত্তেজনার মাথায় বুদ্ধিহীন বউটা বলে বসেছিল, এনে ভাই বউয়ের কাছ থেকে দশ হাজার টাকার পুরস্কারটা বাগাতে বোধ হয়—

কথা অবশ্য শেষ করতে পায়নি বোকা মেয়েটা।

পাঁচ ছ'টা ছেলে মেয়ের সামনে গালে ঠাশ করে একটা চড় খেয়েছিল।

আর পলাতকের দিদিটা? তরুবালা দেবী?

সে তো নিজেই নিজের গালে ঠাশ ঠাশ করে চড মারছে। আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, ও ভগবান, আমি কেন বুঝতে পারলাম না? আমায় কেন কানা অন্ধ করে রেখে দিলে তখন? আমি কেন নিজে তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম। যদি বলতাম রাতটা আমার কাছে থাক, তবে হয়তো ঘুমিয়ে টুমিয়ে বিবাগী বুদ্ধিটা মাথা থেকে চলে যেত। আমি কী করলাম!

॥ ষোল ॥

একটা বয়স্ক মানুষ স্বেচ্ছায় যখন নিখোঁজ হয়ে যায়, তখন ধরেই নিতে হয় এই বিবাগী হয়ে যাওয়াটা বৈরাগ্যের তাড়নায়।

অতএব খুঁজতে চাও তো খোঁজো সেই সব ঘাঁটি, যেখানে বৈরাগ্যের রঙের মেলা।

হয়তো খুব ভুলও করে না পলাতকের হতভাগ্য আত্মীয়জনেরা। যে যখন যে মনোভাবেই তার জীবনের পরিচিত গণ্ডী থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে হারিয়ে যায়, ক্ষণিক আবেগে সাময়িক উত্তেজনায় তুচ্ছ অভিমানে, তার শেষ আশ্রয় ওইখানেই। বৈরাগ্যের দায়ে না হোক, বিড়ম্বনার দায়ে। বেঁচে থাকতে হলেই ন্যূনতম যে রসদ দরকার সেটুকুই বা কোথায় জুটবে এক বস্ত্রে বেরিয়ে পড়া উদাসীদের?—পথ তাদের জন্যে মুক্তির আঁচল বিছিয়ে রেখে দেয়, ভাত বেড়ে বসে থাকে না। ঝকঝকে চেহারা মলিন হয়ে আসে, পরিচ্ছদে ধুলোর স্তর পড়ে। পকেটের পয়সা ফুরোয়। ফুরোয় না শুধু প্রয়োজন।

তবে? হয় রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাও নয় ধুলোমাখা পাগলের মূর্তিতে ঘুরে বেড়াও—নয় সেই উজ্জ্বল বৈরাগ্যের রঙের কাছে আশ্রয় নাও গে।

তবে?

তবে আর হঠাৎ হঠাৎ ধুয়ো তোলো হবে না কেন, 'হৃষিকেশে এক সাধুকে দেখে এলাম। অবিকল সেই মুখ চোখ, সেই আড়ং। ভস্ম মাখলেই কি আর চাপা দেওয়া যায়!'

'দেখে এলাম কনখলে। একটা সাধুর আখড়ায়। পাগড়ি পরা থাকলেই কি আর মুখের গড়ন বদলে যায়। ভুরুর তিলটা ঢাকবার জন্যে পাগড়িটা খুব নামিয়ে পরেছে। আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে হন হন করে চলে গেল।'

'জানিনা কে কোথায় কবে দেখেছে। তবে কান্দীতে অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে কিছুদিন হল এক সাধু আস্তানা নিয়েছেন, ওর সম্পর্কে

আর দ্বিধার নেই। নইলে সাধু বসে বসে ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ে, সেই কাগজেই নাকি তার ছবি।'

নিজের চোক্ষে দেখেছ তুমি?

'আমি নয়, আমার কাকা তো বেনারসেই থাকেন। তাঁর চিঠিতেই —'

এ রকম সব খবর পেয়ে কে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে? ছোটো হৃষিকেশে, কন্‌খলে, হরিদ্বারে, কাশীতে। ছোটো পুরী, ভুবনেশ্বর, বৃন্দাবন। এমন কি হাতের কাছে তারকেশ্বরে, তারাপীঠে। কে বলতে পারে কোন্ দলে নাম লিখিয়েছে সে, কোথায় আত্মসমর্পণ করেছে! শাক্ত? বৈষ্ণব? শৈব? আউল বাউল সহজিয়া? মঠ? মিশন?

॥ সতেরো ॥

কিন্তু কতদিন আর সামর্থ্যে কুলোয়?

একটা সুখী সুখী আরাম আয়েসে অভ্যস্ত মেয়ে বৈ তো নয়? তাছাড়া তার ছেলে? মাত্র আট বছর যার বয়েস।

স্বামীকে তো হারিয়েছে, ছেলেটাকেও কি হারাবে?

অতএব এখন ছুটছে রথীন ভটচায নামের আত্মবিশ্বাসী লোকটা।

লোকটা বলেছে, 'হতভাগা' বলেই ওর জন্যে তোমাদের কাছে হাত পেতে খরচা নিতে হচ্ছে রথীন ভটচাযকে। যদি কখনো দিন পাই শোধ করে দেবো। হিসেব রেখে চলেছি একটা পাঁচ নয়ারও। অন্য সমস্যার সমাধান? কেরোসিন কুকারের কারখানায় তালা পড়েছে, ঝুল জমছে। রথীন ভটচাযের পরিবার পাড়াতেই তরুবালা দেবীর বাড়িতে প্রতিপালিত হচ্ছে।

হয়তো এই সবের স্বাদের মধ্যেও জীবনের মানে ছড়ানো থাকে, কিন্তু একটা শক্ত ছাঁচের মধ্যে আটকে পড়ে থাকলে আর ছড়িয়ে পড়ে থাকা স্বাদগুলোকে কুড়িয়ে তুলে দেখবার উপায় কোথায়? সাহস থাকে শক্তি থাকে ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে পড়ো। অবশ্যই ছাঁচটা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অনেক কিছু ভাঙবে। তোমার অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, তোমার রুচি পছন্দ উন্নাসিকতা, তোমার পরিবেশ পরিচিত সমাজ, সব সব।

এই 'সব ভেঙে যাওয়ার' ভয়ঙ্কর আতঙ্কটাই তো, বুদ্ধিমান মানুষদের শক্ত ছাঁচের মধ্যে আটকে রেখে দেয়। শুধু হয়তো হঠাৎ কোনো এক-দিনই ওই আতঙ্কটাও আর মনে থাকে না। তখন একমাত্র চিন্তা হয়ে ওঠে 'ছাঁচ'-এর মধ্যে আর নয়। ছাঁচের মধ্যে অক্টোপাসের চাপ। ছাঁচের মধ্যে 'জীবনের মানে খুঁজে' পাওয়া যায় না।

একা কি কৌশিক গাঙ্গুলীই ?

অহরহইতো এমন ঘটছে। শুধু তাদের নিয়ে তেমন করে কোনো সমীক্ষার আয়োজন নেই। ঘর ছাড়াদের নিয়ে রিসার্চ করার খেয়াল হচ্ছেনা কারো। হয়তো সেই সব রিসার্চে ধরা পড়ে যেতে পারে, যে ছেলেটা মাধ্যমিকে ফেল হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল, আর যে মেয়েটা ভালবাসায় হতাশ হয়ে গলায় দড়ি দিল, তারা দু'জনে একই ব্যাধির আওতায়।

তা ঘরছাড়াদের ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ টিসার্চ হয় না। শুধু যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তাকেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খুঁজে বেড়ায়।

॥ আঠারো ॥

কিন্তু খোঁজার অভিযানটা যে বারে বারেই ব্যর্থ হচ্ছে।

হবেই।

তার কারণ চেষ্টার মূলেই ভুল। যে রঙের ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে ছুটে ধাওয়া করা কাশী কনখল হরিদ্বার হৃষিকেশ তারকেশ্বর তারাপীঠ বৃন্দাবন বক্রেশ্বর, কৌশিক তো সেই রঙের কাছে আশ্রয় নিতে যায়নি।

অতএব এই অনুসন্ধান পর্বে আশা আর হতাশা, ভাগ্যোদ্যম আর নবোদ্যম, এদের মধ্যেই দড়ি টানাটানি চলছে।

খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ঘরের দরজায় হাত ঠেকাচ্ছে কেউ কেউ, কিন্তু সেটা ভ্রান্ত বুদ্ধির কাজ।

এইভাবে কেউ আত্মহত্যা করতে যায় ? গঙ্গায় ডুবে কি রেলে কাটা পড়তে ? কিম্বা আরো কোনো পথ ধরতে ? অফিসে বিধিসম্মত ভাবে

পদত্যাগ পত্র লিখে রেখে, ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে দ্রুত বেরিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে নতুন চেক বই সংগ্রহ করে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে নিয়ে কেউ আত্মহত্যা করতে বেরিয়েছে এমন শোনা গেছে কখনো ?

কৌশিকদের অফিসে তো সাধারণ অফিস পাড়ায় নয়, কারখানা ঘেঁষা দেহাতী পাড়ায়। তবু কাছাকাছি ব্যাঙ্ক আছে একটা। উৎপলা পরামর্শ দিয়েছিল ওখানেও একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রাখো। হঠাৎ কখন কোন দিন অফিস ফেরত কিছু কাজ করে ফেলবার দরকার হল, ওখান থেকেই তুলে নিয়ে—

হয় কখনো কখনো এমন দরকার।

যেমন সেই একদিন টুবায়ের গরম স্যুটটা দর্জির ঘর থেকে ছাড়িয়ে আনার দরকার ছিল ঠিক সেইদিনই হল না। কৌশিক নিজের চেয়ারে বসে বসেই টেলিফোনের রিসিভারটা কানে চেপে, এবং সেটাতে মুখ চেপে বলে উঠেছিল, আজই দরকার বললে কী হবে ? আমি কি সঙ্গে অত টাকা নিয়ে এসেছি ?

পরদিন ভোরেই প্লেনে চড়া।

উৎপলাকেই আবার সেই গরম স্যুটকে রাতারাতি বাড়িতে এনে ফেলবার জন্যে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল। পোশাকের মালিক, নতুন করে আর একবার তার মায়ের ক্যাপাসিটি এবং বাপের অপদার্থতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেছিল, 'শুধু তোমার হাতে পড়লে যে আমার কী হতো বাপী !'

তবে এই ধিক্কারের ফলশ্রুতি অফিসের কাছাকাছি আর একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা।

তার সুযোগটা কাজে লেগে গেল কৌশিক গাঙ্গুলীর।

খবরটা জানার পর তার স্ত্রী পাথর হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক। তবে বড় একটা আতঙ্ক দূর হয়ে গিয়েছিল।

না, হঠাৎ সাময়িক উত্তেজনায় আত্মহত্যা করতে যাবার কালে কেউ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে যায় না।

॥ উনিশ ॥

কিন্তু কত টাকাই বা নেওয়া গেছে ?

কতদিন চালানো যায় তাতে ?

'কলসীর জল' প্রবাদটা পচা পুরনো কিন্তু সত্যটা তো অপরিবর্তিতই থাকে।

প্রথমটায় এক মাত্রই চিন্তা ছিল, পরিচিত সমাজের চোখ এড়িয়ে পালাতে হবে। কেন ? সেটা মাথায় নেই। পালাতে হবে, অতএব কাছে থেকে দূরে, দূরে থেকে আরো দূরে। হ্যাঁ, হেথা নয় হেথা নয়, আর কোথা আর কোনোখানে।

বাংলা বিহার উড়িষ্যা উত্তর-ভারতে বড় পরিচিতের ভীড়, দাক্ষিণ ভারতটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। অতএব এগিয়ে পড় ওই দিকেই। প্রথম প্রথম অভ্যাসের বশে খরচ করে ফেলেছে ভদ্রস্থভাবে থাকার চেষ্টায়, আস্তে আস্তে সেটা ঘুচতে শুরু করেছে।

একদা যে সব জায়গায় কৌশিক গাঙ্গুলী কোম্পানির পয়সায় স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে চড়ে এসে বেশ রাজকীয়ভাবে কাটিয়ে গিয়েছে, সেখানে যত দ্রষ্টব্য আছে গাড়ি চড়ে চড়ে দেখে বেড়িয়েছে, সেই সব জায়গাতেই স্রেফ দীনহীন মূর্তিতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অথচ কষ্টবোধও নেই।

এ এক অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ।

নিজেকে সম্পূর্ণ নিজের হাতে পাওয়া।

জামাটায় ভাঁজ নেই, বয়ে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছি, থোড়াই কেয়ার। যেখানে যতক্ষণ ভালো লাগছে, বসে থাকছি, কারুর কাছে জবাবদিহির দায় নেই।

কন্যাকুমারীতে তুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে বিবেকানন্দ রক-এর সামনে এক মহান পুরুষের বিশাল মূর্তির মুখোমুখি বসে কতক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছিল কৌশিক, কে জানে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একবার বড় পরিচিত বড় প্রিয় একটা

শিশুকণ্ঠ, 'মা দেখো বাপী কতক্ষণ বোকার মত হাঁ করে বসে আছে। তুমি যে ঝিনুকের খেলনা দেখতে ডাকছ খেয়ালই নেই।'

চমকে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে যাচ্ছিল, আবার বসে পড়েছিল। ····অন্যের ইচ্ছায় ইচ্ছায় বোঝাই নৌকোখানাকে টানতে টানতে, হঠাৎ যেন নৌকো উল্টে সেই 'ইচ্ছে' গুলো পড়ে গেছে জলের মধ্যে, এখন খালি নৌকোটা! টেনে নিয়ে যাবারও দায় নেই। বসে থাকো—চুপচাপ জলের খেয়ালের মুখে। হালকা। কিন্তু বড় যেন শূন্য-শূন্যও।

ওই শিশুকণ্ঠটা মাঝে মাঝে বড় উৎপাত করে বসে। মাঝরাত্তিরে কান্নাচাপা গলায় বলে, 'আর করব না আর কখনো করব না। কানে লাগছে, ভীষণ লাগছে...'

ঘুমের আগে জোরালো বড় আলোটা নিভিয়ে মৃদু নীল পরী-রাজ্যের আভাসবাহী আলোটুকু জ্বেলে ঘুমনোর নিয়মটা পালন করা হয়নি, তাই।

কৌশিক কি ছুটে গিয়ে ওই লাগা কানটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠবে, 'সামান্যর জন্যে এত কেন?'

লাভ নেই।

তাতে শাস্তি বাড়বে বৈ কমবে না। শাসনস্পৃহার সঙ্গে যুক্ত হবে আক্রোশ।

'সামান্য'ই ভবিষ্যতে 'অসামান্য' হয়ে ওঠে এ জ্ঞান যাদের নেই তারাই কথাটা বলে। বলে 'ডিসিপ্লিন' শব্দটার মানে শেখেনি বলে। নিজের ছেলেটাকে নিজের মত করে তৈরি করতে দাও। তোমার পিসির স্টাইলটা ভুলতে চেষ্টা কর।'

এই আশ্চর্য, তবু ছেলেটা একটা অবারিত স্নেহের কাছে আশ্রয় নিতে আসে না। যেন মন্ত্রঃপূত। আবার তার থেকে বেশী আশ্চর্য, ওই শিশুকণ্ঠটাই নিশ্চিন্ততার হালকা নৌকায় মাঝে মাঝেই ঢিল ফেলে।

'আমি কী করবো? আমি কী করবো? অন্য ছেলেরা যদি আমার বইতে কালি ঢেলে দেয়?'

কিন্তু কৌশিক নামের লোকটা যদি চুপিচুপি বলতে যায় 'কী হয়েছিল রে কাল?'

ঠিক শুনবে 'কিছু না।'

'তবে পিটুনি খাচ্ছিলি কেন? বলনা তোর কোন বইতে কালি লেগেছে? এনে দেব আর একটা—'

'বোকার মত কথা বোলোনা। ফাঁসি হতে চাও বুঝি?'

তবু সেই শিশুকণ্ঠ, সেই ফর্সা গোলগোল মনিবন্ধ ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখা, সেই স্কুলে বাসে ওঠার সময় রাস্তা থেকে মুখ উঁচু করে 'টা টা' করা এক একটা নিশ্চিন্ত মুহূর্তকে যেন হঠাৎ চিরে কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

নাঃ। কাজ চাই। কিছু একটা করা চাই। শুধু এখান থেকে ওখান, কাছ থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ানো, এই জীবনের মধ্যেই বা কোন মানে?

তবে কি কৌশিক ওই গৈরিক রঙে রঙিনদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে? বলে উঠবে, এখানে কি জীবনের মানে খুঁজে পাওয়া যাবে?

কি জানি, তেমন কোন প্রেরণা আসে না। চিরকাল ওই সংসার উদাসীনদের সম্পর্কে উদাসীন থাকার ফল এটা। অনভ্যাস।

অথচ জীবন একটা চাই। আবার কি সেই পুরনো ছাঁচটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়া যাবে? খোলা ভেঙে বেরিয়ে এলে ডিমের কুসুমটা আবার খোলাটার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে?

হয়তো গেলে যাওয়া যেত সেই সময় যখন কাগজে কাগজে ঘোষণা দেখা গিয়েছে 'সন্ধান চাই। গত বাইশে জুন সন্ধ্যা হইতে নিখোঁজ। নাম কৌশিক গাঙ্গুলী লম্বায় ছয় ফুট এক ইঞ্চি। মাঝারি রং, মাঝারি গড়ন, সন্ধানে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।'

তখন হয়তো হাসির মত মুখ করে ওই ঘোষকদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলা যেত, পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হয়ে ছিল কৌশিক গাঙ্গুলীর দাম কতখানি। আর তার জন্যে কতটা ধার্য করা হতে পারে। ....দশ হাজার? তাই বা মন্দ কী? তবে আর কেউ খবর দিয়ে ফেললে

তো মুসকিল হতো। ছেলের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার তহবিলে একটা বড় ছোবল পড়ত। আমি তো আর হা হা হা—

আবার পুরনো ছাঁচে ফিরে যাওয়াটা হয়তো তখনো 'হাস্যকর' হয়ে উঠত না। মনে হত সত্যিই বোধহয় মজা।...তবে ওই 'দুর্জয় কোম্পানির কাজটা' ওটাতে আর ইচ্ছে ছিল না বলেই—

হ্যাঁ, এসব হয়তো বলা যেত তখন। কখনো, কোন দুর্বল মুহূর্তে ভেবেছে কৌশিক গাঙ্গুলী। এখন অবশ্য আর ভাবার প্রশ্ন নেই। কতদিন হয়ে গেল কে জানে।

খবরের কাগজ আর পড়াই হয়নি কতদিন।

ক্রমেই যেন সভ্যজীবন থেকে খসে পড়া হয়ে যাচ্ছে। সাজ-সজ্জায় পরিপাট্যহীন, নিত্য দাড়ি কামানোও অবান্তর। চেহারায় মালিন্য, মুখ লাবণ্যহীন।

হোটেলে ঘর বুক করে ঢুকে পড়ার প্রশ্ন আর নেই, এখন ভরসা ওয়েটিংরুম আর ধর্মশালা। শুধু ট্রেনের টিকিট কেনবার সময় কিছুতেই শ্রেণীটাকে নামিয়ে আনতে পারে না। ঠিক এগিয়ে যাবে ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট বুকিঙের খুপরির সামনে।

অথচ বেশিদিন কোনো একটা জায়গায় স্থির হয়ে টিকতেও পারে না। রেলগাড়িটা যেন নেশার মত হয়ে গেছে, পথ অবিরত হাতছানি দেয়। হয়তো একই পথে বারবার যাওয়া হয়ে যায়। পথে পথে কত লোকের সঙ্গে ঘণ্টা কয়েকের আলাপ হয়, কত সময় আলাপের পথ বন্ধ করে মুখের সামনে একটা বই কি কাগজ তুলে ধরে বসে থাকার কৌশল করতে হয়।

তবু মাঝে মাঝে আশ্চর্য না হয়ে পারে না কৌশিক। এতগুলো দিনের মধ্যে একটাও চেনামুখের মুখোমুখি হতে হলও না তো! যেটা হবার ভয়ে পরিচিত জায়গাগুলোকে এড়িয়ে দক্ষিণ ভারতের গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেটার অভাবেই মাঝে মাঝে শূন্যতা বোধ হয়।

কাগজে কাগজে 'পুরস্কার ঘোষণা' দেখে প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, ওই বুঝি কে এসে ধরে ফেলে।...ধরে ফেললেই তো টানতে টানতে

নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। বলবে 'কেন? কেন? কেন? জবাব দাও। কেন তুমি—'

কিন্তু এখন যেন ওই কাঠগড়াটার অভাবেই হতাশা আসে। কৌশিক গাঙ্গুলীকেও চিনে ফেলবার মত লোক জগতে এত কম? তবে কি সে এবার রুট বদল করবে? যেখানে চিনে ফেলতে পারে সেই রকম জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে?

আর যদি বা কেউ ধরে ফেলতে আসে, তখন ঝেড়ে জবাব দেবে। 'কৌশিক গাঙ্গুলী? জীবনেও এ নাম শুনিনি। আপনি ভুল করছেন।'

এই রকম একটা নাটকীয় ছবি অনেক সময়ই কল্পনায় এসে যায়। কতবার ভেবেছে কোনো একটা অজানা স্টেশন থেকে একটা পোস্ট-কার্ড লিখে ফেলে দেবে, 'আমি ভাল আছি। খুব ভাল। আমার জন্যে চিন্তা কোরোনা।'

ভেবে আবার মনটা গুটিয়ে আসে।

'আমি ভাল আছি' এইটাই শেষ কথা?

'তোমরা কেমন আছ?' এ প্রশ্নটা থাকবে না? নাঃ। তা হয় না। অমানবিক এই চিন্তাটা ঠেলে সরিয়ে রেখেছে। 'তোমরা কেমন আছ' জানতে চাইলেই তো ধরাপড়া।

চলন্ত রেলগাড়ির মধ্যে বসে এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে চলেছিল কৌশিক, 'তারা কেমন আছে।' এই কথাটা তেমনভাবে পীড়িত করে নাই বা কেন? অথচ তখন তো ওদের সামান্য অসুখেই কত অস্থিরতা, কত উদ্বেগ। আচ্ছা আমিই কি সেই কৌশিক গাঙ্গুলী? সেই দুর্জয় ইঞ্জিনিয়ারিঙের 'গাঙ্গুলী সাহেব', রামময় রোডের উৎপলা গাঙ্গুলীর স্বামী, আট বছরের শৌনক গাঙ্গুলীর বাবা।

কিছুতেই কেন অনুভবে আনতে পারি না সেটা। কোনমতেই বিশ্বাস হয় না এই আমিটা সেই আমি।

গরমের দুপুর।

চলন্ত ট্রেনের মধ্যে যেন জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপ। তবু কাচের

পাল্লার ট্রেন এই যা ভরসা। একটু পরেই নেমে পড়া যাবে। অবশ্য নেমে পড়েও কিছু শীতলতা নেই। এই দেশটায় মাত্র তিনটেই ঋতু। তপ্ত, উত্তপ্ত, উত্তপ্ততর।

চার কামরার এই বার্থটায় আপাতত তিনজন যাত্রী। একদিকে কৌশিক, অপরদিকে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি যুবতী মেয়ে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে একখানা স্টেটসম্যান পড়ছিল, এখন সেটাকে শুধু মুখের সামনে খুলে ধরে রেখেছে। এবং তার আড়ালে—সঙ্গের ভদ্রলোকের সঙ্গে, সম্ভবত বাবাই, খুব নিচু গলায় কিছু বলাবলি করছে।

কাগজটা একটু দেখবার জন্যে মনটা উসখুস করছিল কৌশিকের। পড়ছিস না তো অকারণ খুলে ধরে বসে আছিস কেন?

যদিও সাজ দেখলে বোঝার উপায় আর নেই এখন। সমগ্র পৃথিবীরই ভদ্র পুরুষের একই পোশাক। এবং মেয়েদেরও মোটামুটি 'সর্বভারতীয়' একটা আছে। তবু কৌশিকের মনে হল নির্ঘাৎ এরা বাঙালী। নিজের কাজ মিটে গেছে, তবু কাগজটা এগিয়ে ধরছে না। অন্য কেউ হলে পড়ার শেষে ভাঁজ করে এগিয়ে ধরে অফার করতো।

মনে হচ্ছে নিজেদের কথাবার্তাগুলো যতটা সম্ভব আড়াল করতে চাইছে। কথা তো শুধুই গলার স্বরের উচ্চারণে ব্যক্ত হয় না, মুখের সমস্ত রেখায় রেখায় উচ্চকিত হয়।

যখন কৌশিক ভাবছে দূর ছাই, আমার এত হ্যাংলামি কিসের—তখনই হঠাৎ প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাগজের আড়াল ভেদ করে ইংরাজিতে প্রশ্ন করে উঠলেন, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?

কৌশিক চমকিত হল।

ইংরাজিতেই উত্তরটা দিল, বলুন।

যদিও জিগ্যেস করাটা ভদ্রতা নয়, তবু আমার মেয়ের সঙ্গে আমার একটা তর্ক হচ্ছে, তাই জিগ্যেস করে ফেলেছি, আপনি কি বাঙালী?

কৌশিক মনে মনে হাসল।

তার মানে আমার অনুমান ভুল নয়।

তবু সরাসরি উত্তরটা না দিয়ে ইংরাজিতেই বলল, আপনাদের তর্কের বিষয়বস্তু হতে পেরে নিজেকে বেশ গৌরবান্বিত মনে করছি। কিন্তু আপনাদের এ সন্দেহের কারণ কী বলুন তো ?

ভদ্রলোক মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বিপন্ন গলায় বললেন, কারণটা আমার মেয়েই জানে।

কৌশিক হঠৎ হেসে ফেলে।

কেন কে জানে কৌশিকের মধ্যে একটা আহ্লাদ আহ্লাদ ভাবের ঢেউ ওঠে। কে জানে কেন !

এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে কৌশিক বাঙালী কি দেখেনি ? না বাংলা কথা শোনেনি ? যদিও শহরের পরিবেশ থেকে দূরে দূরেই ঘুরেছে, এবং সর্বত্রই নিজের কাজ চালিয়েছে ইংরিজিতে, যেটা ও'দিকে প্রায় সর্বজন-বোধ্য, তবু ট্যুরিস্ট বাঙালীর দলের হৈ চৈ, কথাকাকলী শুনেছে বৈকি। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে কৌশিক গাঙ্গুলীকে জিগ্যেস করেনি, 'আপনি কি বাঙালী ?

হেসে ফেলে কৌশিক পরিষ্কার বাংলায় বলল, তার মানে আপনারাও বাঙালী। বাঙালীর মেয়ের কৌতূহল একটা প্রবাদ বচন।

বাবা !

মেয়েটি প্রায় হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত বলে ওঠে, দেখলে ?

বাবা হেসে বললেন, দেখলাম।

মেয়েটি বলল এরপর কিন্তু একটিও ইংরিজি শব্দ নয়। উঃ, বাংলা এত কম শুনি -

কৌশিক বুঝল এঁরা ভ্রমণকারী নয়, বোধকরি বাসিন্দা।

প্রশ্ন করল, এখানেই থাকেন বুঝি ?

প্রশ্নটা অবশ্য বাবার দিকে তাকিয়ে।

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, অনেকদিনই আছি। আপনি ?

আমি ? আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মেয়েটি উৎসুক গলায় বলল, শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? একা ? সঙ্গে জিনিসপত্র কই ?

অনেকদিন পরে যেন মরুভূমির শুকনো বালিতে ধারাবর্ষণ !

কতদিন এমন একটি সুললিত কণ্ঠ শোনেনি কৌশিক। শোনেনি তার সম্পর্কে এমন প্রশ্ন। আর কতদিন কৌশিকের এমন হেসে হেসে কথা কইতে ইচ্ছে হয়নি।

অতএব কৌশিক বলল, হেসেই বলল, একদিন তো 'একাই' এসেছি আর 'একাই যেতে হবে।

ওরে ব্বাস ! একেবারে দার্শনিক তত্ত্বে চলে গেলেন দেখছি। বাবা, আমি যদি এঁকে জিগ্যেস করি, ইনি কোথায় যাচ্ছেন, তাহলে কি তুমি আমায় বকবে ?

বাবা হা হা করে হেসে উঠলেন, জিগ্যেস করতে তো বাকিই রাখিল বড় ? বুঝতেই পারছেন আমার মেয়েটির কৌতূহল একটু বেশি !

কৌশিক মেয়েটির দিকে তাকাল।

সিঁদুর টিঁদুর দেখতে পেল না। কুমারী হওয়াই সম্ভব। অবশ্য ওটা কোনো যুক্তি নয়। বিবাহিতারা সবাই কিছু আর সিঁদুর পরে না।··· তবে বাপের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছে যখন।···রং ফর্সা বলা চলে না, মুখ চোখও নিখঁত নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন একটা লাবণ্য আছে, যা ওই খুঁতগুলো মনে করতে দেয় না।

কিন্তু এতবড় মেয়ে, বিয়ে হয়নি কেন ? সাতাশ আটাশ তো হবেই, তিরিশও হতে পারে। বিধবা ? ভগবান জানেন। সাজ-টাজ দেখলে তো আর বোঝা যায় না আজকাল। কিন্তু বিধবা হলে কি এত 'জলি' হয় ? তাদের ব্যবহারে কোথায় যেন উচ্ছ্বাসেরও একটা সীমারেখা থাকে।

কুমারী ভেবে যে কৌশিকের কেন বেশ ভালো লাগল কে জানে।

কৌশিক হাসল, বুঝতে পারছি, কিন্তু উত্তরটা তো আপনাদের জানা। আপনারাও যেখানে যাচ্ছেন, আমিও সেখানে। কারণ ট্রেনটার তো ওই পর্যন্তই দৌড়।

খুব ভাল। ভদ্রলোক বললেন, বাঙালী এ অঞ্চলে একটু কমই দেখতে পাওয়া যায়। আশা করি আমাদের আজকের এই পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হবে।

দীর্ঘস্থায়ী।

কৌশিক একটু হাসল, সেটা বলা মুশকিল।

কেন? মেয়েটি তীক্ষ্ণ হল। আপনি বুঝি আমাদের অপছন্দ করছেন?

আঃ! সীমা, তোর আর ছেলেমানুষী গেল না।

তার মানে মেয়েটির নাম সীমা।

কৌশিক বলল, এমন এক কড়া প্রশ্ন করে বসলেন যে বলে ফেলা ছাড়া উপায় রইলনা। বলছি—আমার নিজেরই যখন কোনো স্থায়িত্ব নেই, তখন কী করে—

এখানে থাকবেন না বেশিদিন?

হয়তো নয়, হয়তো থাকতেও পারি।

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে বলল, তার মানে নিজেকে আপনি একটি 'ভব-ঘুরে' বলে জাহির করতে চাইছেন?

আপাতত আমি তাইই।

মেয়েটি অর্থাৎ সীমা বাপের সঙ্গে চকিত একটি দৃষ্টি বিনিময় করে বলে উঠল, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ঠিকানা চাইলে দেবেন না।

ঠিকানা!

কৌশিক মৃদু হাসল, থাকলে হয়তো এ প্রশ্ন উঠতো, দিতাম কি দিতাম না। কিন্তু জিনিসটা নেই। তবে এখন—আজকের ঠিকানা ওয়েটিংরুম।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, বেশি কিছু প্রশ্ন করে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না, তবে যদি একটি আর্জি পেস করি রাখবেন?

কৌশিক চকিত হয়ে বলল, কী ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার আর কিছু নয়। অনেকদিন বঞ্চিত আছি, একটু বাংলায় আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে। দয়া করে যদি—

কৌশিক অবাকই হল।

ভদ্রলোক বলেন কি?

হেসে বলল, আমার পক্ষে লোভটা কম নয়। কিন্তু তা কী করে সম্ভব ?

সীমা আবার তীক্ষ্ণ হল, কেন ? অসম্ভবটা কিসে ? যদিও আমাদের থাকার ব্যবস্থাটা নেহাতই সাধারণ, তবু ওয়েটিংরুমের থেকে অন্তত খারাপ নয়।

কৌশিক একটু গভীর হল।

বলল, এটাকে অন্যদিক দিয়েও ভাবতে পারেন। আমি যে কে আপনারা তো কিছু জানেন না। খুব খারাপ লোক হতে পারি।

সে দায়িত্ব আমাদের।

সীমার পরিষ্কার গলা।

ভদ্রলোক বললেন, বুঝতে পারছেন, আমার মেয়েটি শুধু কৌতূহলীই নয়, ঝগড়ুটেও।

সেটাও বাঙালী মেয়ের জাতীয় লক্ষণ।

কথাটা বলেই মনে হল কৌশিকের, আচ্ছা আমি তো এখনো আগের মতই চটপট কথা-টথা বলতে পারছি।

সীমা উঠে দাঁড়াল।

বলল, বাঙালী মেয়ে সম্বন্ধে ভালমত রিসার্চ করেছেন মনে হচ্ছে। তাহলে আরো একটা লক্ষণও জানেন নিশ্চয়।

বলে উঁচু থেকে কী সব পেড়ে ফেলল চটপট, এবং খুব দ্রুত হাতে দুটো প্লেটে বেশ গুছিয়ে খাবার সাজিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, বাবা, তুমি আবার এখন সাবান দিয়ে হাত ধুতে ছুটবে তো ? এক্ষুনি এগিয়ে যাও চটপট।

ফিরে তাকিয়ে বলল, বাবা তো ডাক্তার মানুষ, হাতধোয়া বাতিক। আপনার নেই নিশ্চয় ? আমি বলি, চামচ দিয়েই তো খাবে—

কৌশিক বলল, আমার কথাটাও উঠছে ?

উঠবে না। বাঙালী মেয়ে না ?

বাবা চলে গেলেন তোয়ালে আর সোপকেস হাতে।

সীমার কথা এত সপ্রতিভ আর সাবলীল যে কৌশিকের আড়ষ্টতা

দাঁড়াচ্ছে না। বলল, আমার অবশ্য আপাতত সৌজন্য করেও 'না না' করার মত মনের জোর নেই। দারুণ খিদে পেয়েছে, এবং স্বীকার করছি বহুদিন এমন সুখাদ্য জোটেনি। কিন্তু প্লেট তো দেখেছি দুটো। অন্যের খাবারে ভাগ বসাতে চাই না।

সীমা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ওর ঝুড়ি ঝাঁপি আর কৌটোগুলোর ভিতরটা দেখিয়ে দিল। দেখা গেল, মজুত ভাণ্ডার অনেক। অন্য এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে ফিরে রাত্রে আর রান্নার ঝঞ্ঝাট করবে না বলে সীমা অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়ে এসেছে।

ওর এই নীরব উত্তরদানের ভঙ্গিতে কৌশিক হেসে ফেলে বলল, তাহলে তিনটে প্লেট নয় কেন ?

সীমা খুব গম্ভীরভাবে বলল, শরৎবাবুর নায়িকারা পরেই খায়।

কৌশিকের আর একবার মনে হল, ধূ ধূ মরুভূমিতে বৃষ্টি নেমেছে বুঝি।

উনি ডাক্তার ?

হ্যাঁ। এখানের মিশন হসপিটালের।···একটু হাসল, প্রায় অনাহারি পোস্টই, তবে এটাই ওঁর জীবনের লক্ষ্য। এই আর কী।

ভদ্রলোক চলে এলেন, বললেন, ধুয়ে আসবেন নাকি হাত-টাত ?

তাই ভাবছি। যদিও আমি ডাক্তার নই।

কৌশিকের সেই ব্রীফ কেসটাতেই ভাঁড়ার, সেটা খুলে সাবান তোয়ালে বার করে নিয়ে চলে গেল।

হাতের জন্যে যত না হোক, মুখটা ধুতে ইচ্ছে করছে।

বাথরুমে ঢুকে প্রথমে ভাবল, মেয়েটা কী অদ্ভুত! তারপর ভাবল বাবাই বা কী, অনায়াসে আমার মত একটা ছন্নছাড়া লোককে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে কী বলে ?

॥ কুড়ি ॥

ডাক্তারবাবু বললেন, দেখ্, সীমা, তোরটা না নেওয়া পর্যন্ত ইনি যখন কিছুতেই খাবারে হাত লাগাতে রাজী হচ্ছেন না, নিয়ে নে তোরটাও।

ঠিক আছে। তার আগে তাহলে তোমাদের প্লেটে আরো কিছু চাপিয়ে তবে—

দিয়ে দিল আরো দু'খানা করে স্যাণ্ডুইচ, চপ, মিষ্টি।

ডাক্তারবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ওঁর ওপর রাগ করে আমার ঘাড়ে এত চাপাচ্ছিস যে?

কৌশিক গম্ভীর ভাবে বলল, ওঁর রাগের কারণ হয়ে আমি কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হচ্ছিনা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, খাদ্য জগতে যে এসব সুখাদ্যরা আছে, তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

ডাক্তারবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন, ভুলবেনই তো, যা দেশ। স্টেশনে স্টেশনে সেলোফেন প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে দই ভাত। ভবেতে পারেন? আমাদের বাঙালীর মুখ তো—এখানে মিশনে একটি মাত্র বাঙালী স্বামীজী আছেন। তিনি তো আমার সীমা মায়ের রান্নাঘরের নিত্য অতিথি।...ও যখন আসেনি, আমিও তো—

হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে বলে উঠলেন, আমার কিন্তু কথা বলার অসুবিধে হচ্ছে! আপনার নামটা জানা দরকার।

কৌশিক বলল, ভবঘুরেদের ঠিকানাও থাকে না, নামও থাকে না।

সীমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হাত ধুয়ে এসেছে। কথার শেষটা শুনতে পেয়ে বলে উঠল, ভবঘুরেদের কিন্তু আঙ্গুলে আংটির আর রিস্টে রিস্টওয়াচের দাগও থাকে না। দাগগুলো এখনো মিলোয়নি। তার মানে পাকা ভবঘুরে হননি!

কৌশিক স্তম্ভিত হয়ে তাকাল নিজের হাতের দিকে। মানুষের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ হয়? এবং বুদ্ধি এত প্রখর?

সত্যি, মাত্র কদিন আগেই জিনিসগুলো ঘুচিয়েছি। বেচতে গিয়ে বলতে হয়েছে, বিদেশে এসে টাকা পয়সা হারিয়ে ফেলে বিপদে পড়েছি, তাই—

ঘড়িটা ছিল বিদেশী ঘড়ি, দামী জিনিস, সিকি দামে দিয়ে দিতে হয়েছে। তবু তার জন্যে তেমন মন খারাপ হয়নি, কারণ জিনিসটা দুর্জয় কোম্পানির উপহার মাত্র। চাকরির প্রথম দিকে বলতে গেলে বোনাস

স্বরূপ। কিন্তু আংটি দুটো? বিয়ের না হলেও বিয়ের সময় পাওয়া।

উৎপলার বাপের বাড়ির দিকেরই কেউ দিয়েছিল। উৎপলা তাই ওগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিল।

কিন্তু উপায় থাকল না।

কৌশিক বলে উঠল, আপনার বোধহয় খুব গোয়েন্দা গল্প পড়ার অভ্যাস?

মানুষের সাধারণ বুদ্ধির ওপর আপনার বিশ্বাস নেই বুঝি?...বাবা। উনি যদি নাম বলতে অনিচ্ছুক হন, ভবঘুরে বলেই ডেকো।

তাই ডাকব।

যেন নিশ্চত হয়ে গেছে—এই ভবঘুরে লোকটা এদের সঙ্গেই যাচ্ছে।

নিন, উঠে পড়ুন, গাড়ি স্টেশনে ইন করল।

॥ একুশ ॥

অমোঘ নিয়তি।

অনিবার্য পরিণতি।

রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিংরুমের পরিবর্তে মিশন হসপিটালের ডাক্তার অরবিন্দ ব্যানার্জির কোয়ার্টার্সের তিনখানা ঘরের একখানা ঘর। কিন্তু কেনই বা তাঁরা একটা অজানা অচেনা লোককে? কেনই বা এত সহজে?

এই কেনগুলোর উত্তর দেওয়া শক্ত।

কেন যে মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সুখের সর্বপ্রকার উপকরণ থাকতেও হঠাৎ একদিন 'জীবনের মানে' খুঁজে পায় না, হঠাৎ একদিন পথে দেখা একজনকে দেখে মনে হয় 'চিরকালের চেনা', কেনই বা একজনের কণ্ঠস্বরে অপর একজনের বুকের মধ্যে ঘণ্টা বেজে ওঠে, আর কেনই বা সদ্য পরিচয়ের সীমান্তে দাঁড়িয়েও একজন অপরজনের অনুরোধ ঠেলা অসম্ভব মনে করে,—এ এক রহস্য। তবু এ সব ঘটে থাকে।

মিশনের এলাকার মধ্যে মহিলাদের থাকা নিষেধ, তাই ডাক্তার ব্যানার্জির কোয়ার্টার্স স্বামীজীদের এলাকার বাইরে। অবশ্য এ ব্যবস্থা খুব বেশী দিনের কথা নয়।

পদবী বদলে যাওয়া সীমা যখন তার নতুন পাওয়া পদবীটা ছেঁড়া জামার মত ছেড়ে ফেলে দিয়ে আবার তার পুরনো পদবীতে ফিরে এল বাপের কাছে আশ্রয় নিতে, তখন তো—

বাবা ভিন্ন তার যখন আর কেউ নেই, তখন তার কথা তো ভাবতেই হবে? একটু অসুবিধার জন্যে মিশন কি তার 'সেবাশ্রমের' পরম সুহৃদ ডাক্তার ব্যানার্জিকে হারাবে? অতএব অদূরে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা।

কিন্তু কৌশিক গাঙ্গুলীই বা কী করে অপ্রতিবাদে ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলে এল? 'কেন এল' সেটা তো অজানা জগতের রহস্য। তবে একেবারে অপ্রতিবাদে বলা চলে না।

বার বার প্রশ্ন করেছিল বৈকি, ধরুন আমি একটা খুনী আসামী, খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি; অথবা আমি একটা ডাকাতির কেসের নায়ক। কি একটা রাজনৈতিক অপরাধী। হট করে বাড়িতে নিয়ে যাবেন? বিপদে পড়ে যাবার ভয় নেই?

ডাক্তার ব্যানার্জির মুখে একটা প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন, বিপদের খবর ভেতর থেকে এসে যায়। একজন ভালো রিপোর্টার অবিরত কাজ করে চলে সেখানে, ঠিক ঠিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়।

॥ বাইশ ॥

কি মনোরম! কী মনোরম! কী বাগান, কী খোলামেলা।

একটি হাসপাতালের পরিবেশ এত অপূর্ব হয়? ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে দেখে কৌশিক। আর নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, ওহে কৌশিক গাঙ্গুলী, আর কতদিন বোকার মত পালিয়ে বেড়াবে? বসে পড় না, থেকে যাওনা?

এখানে সবাই কাজ করে।

গেরুয়া পরেও রেহাই নেই। অফুরন্ত কর্মপ্রবাহ।

রোগীদের প্রতি কী অপরিসীম মমতা আবার ডাক্তারের প্রতি রুগীদের কী গভীর ভালবাসা।

এই ভালবাসায় ভরা কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া যায় না?

তার মানে অবশেষে সেই উজ্জ্বল গৈরিকের কাছে আত্মসমর্পণের নম্রতা।

ডাক্তার ব্যানার্জি, একটা হতভাগ্য বেকারকে অকারণ আর কত দিন পুষবেন? আপনার 'সেবাশ্রমে' আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না?

চাকরি? এখানে?

ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন. এখানে আপনি কী কাজ করবেন বলুন তো?

এনিথিং। নেহাৎ জমাদারের কাজটা বাদে। সত্যি বলতে এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ডাক্তার ব্যানার্জি, স্বামীজীর কাছে, একবার আমার আর্জিটা পেশ করে দিয়েছিলেন?

ডাক্তার ব্যানার্জি, চাকরি বাকার গোছের একটা কিছু না পেলে, অবশেষে এই মনোরম জায়গাটা ছাড়তে হবে আমায়। হিসেব পত্তর রাখার কাজ, দোকান বাজার, কেরানীগিরির কাজ, খিদমদগারির কাজ, হসপিটালের গেট পাহারাদারের কাজ— একটা কিছু। নামকা ওয়াস্তে। মাইনে ফাইনের দরকার নেই, শুধু একটু খেতে থাকতে দিলেও—

জপানো চলছে প্রতিদিন। এইখানেই কি তবে 'জীবনের মানে' পাওয়া গেছে?

॥ তেইশ ॥

সীমা বলে, কী হল আপনার? ভবঘুরে মশাই, মনে হচ্ছে যেন সর্বদা ছুঁচ ফুটছে।

তা ফুটছে সত্যি।

কেন বলুন তো?

আপনিই বলুন।

বলছি। যদিও বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে—কিছুতেই আর আমাদের অন্নজল গলা দিয়ে নামাতে পারছেন না। এই তো? অর্থাৎ কিছুতেই আপন ভাবা যাচ্ছে না।

এটা আপনার ভুল ধারণা। বেকারের যন্ত্রণার বাড়া যন্ত্রণা নেই জানেন তো ?

তারপর একটু আস্তে গভীর ভাবে বলে, আসলে এই জায়গাটা এত ভাল লেগে গেছে, ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

এই কর্মযজ্ঞের মাঝখানে কোন কিছু না করে স্রেফ বসে থাকা যায় ?

তা বেশ !

সীমা বলে, আপনার অতীত সম্পর্কে তো মুখে তালাচাবি এঁটে বসে আছেন, বাবার নিষেধ কৌতূহল নট, কিন্তু কাজ করতে হলে তো কিছু একটা কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার ? আপনার কোয়ালিফি-কেশন কী বলুন ?

কৌশিক চট করে উত্তর দিল, ভাল বাংলায় ভাল আড্ডা দিতে পারা।

সীমা রাগ দেখিয়ে বলল, বেশ তাই বলুন গিয়ে স্বামীজী মহারাজকে। এই যে আমিও তো কিছু করি না। বসে খাই !

কৌশিক জানে সীমা নার্সিং শিখছে।

কৌশিক জেনেছে সীমা এইখানেই থেকে যাবে।

একদা কৌশিক যখন বলেছিল, ডাক্তার ব্যানার্জি, মেয়েটি তো ভাল ভাল খাইয়ে আর যত্ন করে আপনার অভ্যাস খারাপ করে রেখে দিচ্ছে, এরপর যখন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে—তখন ?

সহজ পরিহাসের কথা, তবু ডাক্তার বিচলিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, সে প্রশ্ন আর নেই বাবা। বিয়ে দিয়েছিলাম। সইল না।

সইল না ? মানে তিনি মা-রা—

না না, সে ভালই আছে, আর একবার বিয়ে করেছে— ডিভোর্স হয়ে গেছে।

সীমার রাগের কথায় কৌশিক হাসল। বলল, মেয়েদের বসে খাওয়া মানায়।

এ যুগে তো লোকে ঘোড়া পোষে না। তাহলে বরং একটা ঘাস কাটার চাকরি পেতেন।

কৌশিক বুঝতে পারে না, মনের মধ্যে হঠাৎ সর্বদা এমন একটা আনন্দ আনন্দ ভাব থাকে কেন।

সীমা ভেবে পায় না কেন তার মনের মধ্যে একটা বিষণ্নতার ভার লেগে থাকে।

অথচ সীমা তার অতিথিকে বুঝতে দিচ্ছে না যে সে বিচ্ছেদ বেদনা ভারাক্রান্ত।

সীমার মধ্যে বিন্দু বিন্দু সুখের কণা পদ্ম পাতায় পড়ে পড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সীমার ভয় ওই সুখের বিন্দুগুলি থাকবে না। সীমা তাই ওই অতিথির ডান ভুরুর উপরের তিলটা দেখলেই শিউরে ওঠে।

॥ চব্বিশ ॥

আবার নিয়তি আসে অমোঘের মূর্তিতে।

ডাক্তার ব্যানার্জি ডিউটি দিয়ে ফিরে এসে বললেন, এই শোনো হে ভবঘুরে, স্বামীজী মহারাজের কাছে বলতে বল, কিন্তু 'ভবঘুরে' নামে কি চাকরি হয়? বল বাপু?

আজকাল আপনি থেকে তুমি।

মেয়ের মতই বলেন 'ভবঘুরে'।

কৌশিক একটু হেসে ফেলে। বলে, ঝাড়ুদারের চাকরিও হয় না?

নাঃ। তার জন্যেও নাম ধাম বংশ পরিচয় ঠিকুজি কুলুজি গুণাবলী সব দরকার হয়।

মেয়ের হাত থেকে ভিজে তোয়ালেখানা দিয়ে মুখ মাথায় চাপাতে চাপাতে বললেন, মিশনের নিময় রীতিমত কড়া তো!

কৌশিক একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, যত সব বললেন, তার সবগুলো দিয়ে উঠতে সময় লাগবে। আপাতত যতটুকু পারব দিচ্ছি।

উঠে চলে গেল।

ওর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেই তার ভাঁড়ারের

মধ্যেকার একটা খোপ থেকে টেনে বার করে আনল একটা নেম কার্ড। যার একটা গোছা ওই খোপটার মধ্যে পড়েই ছিল এতদিন।

এনে বাড়িয়ে ধরল।

'কৌশিক গাঙ্গুলী'।

নামের তলায় ছোটো কতক অক্ষরের সংকেতে তার ডিগ্রির পরিচয় এবং তারপর পরিচয় সেই দুর্জয় ইঞ্জিনিয়ারিঙের চেয়ারটার।

কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে ডাক্তার যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, আর তারপর বসে পড়ে বললেন, ঈশ্বরের এ কী খেলা। অ্যাঁ! কী অভাবিত। কী অসম্ভব।

কৌশিকও বসে পড়েছিল।

চুপচাপ বসেছিল। ও বুঝতে পারছিল তার জীবনের ঘটনার স্রোত এবার দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর এভাবে নাম পরিচয়হীন একটা রহস্যের মূর্তি নিয়ে এখানে কাটানো যাবে না। হয় খুলে ধরতে হবে রহস্যের যবনিকা, নয় আবার পালাও পালিয়ে বেড়াও।

খুলেই ধরল।

কার্ডখানা রেখে দিয়ে ডাক্তার স্নান করতে চলে গেলেন। সীমা টেবিলে তিনটে থালা পেতে রেখেছে। এখন জলের গ্লাসগুলো ভরছে।

ভিজে হাত মুছে, ঘর থেকে নিয়ে এল একগোছা খবরের কাগজের কাটিং। কেমন একরকম অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করলেই এখন আপনি আমায় দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারেন।

তারপর বলল, প্রথম দিনেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বাবা বিশ্বাস করেন নি। আমি কিন্তু—

চুপ করে গেল।

কৌশিক ওর চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে কঠিন গলায় বলল, কিন্তু কী আপনি? দশ হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়িতে এনে পুরে ফেললেন?

সীমা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ধরে নিন তাই।

এতগুলো কাটিং জমিয়ে রেখেছিলেন? আশ্চর্য তো।

সীমা মুখ তুলে বলল, জমিয়ে রেখেছিলাম কাটিং নয়, ছবি।

গলাটা একটু কাঁপল, কী যে অদ্ভুত, বার বার দেখতাম, আর মনে হত যেন খুব চেনা। কতকালের চেনা। দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ভুরুর উপরকার তিলটা পর্যন্ত।

আচ্ছা শুনুন, ওই কার্ডটা ছিঁড়ে ফেললেই তো ঠিক হয়ে যায়?

সীমার দৃষ্টি বদ্ধ গম্ভীর, সীমার গলার স্বর রুদ্ধ,—তাই কি হয়? তাই কি উচিত?

॥ পঁচিশ ॥

ডাক্তার ব্যানার্জিও অনেকক্ষণ পরে বললেন, তাই কি ঠিক? তাই কি উচিত? এটা ঠিক নয়। এটা উচিত হয়নি তোমার। ছি ছি! স্ত্রী আছে, ছেলে আছে, তাদের সঙ্গে রিলেশান খারাপ ছিল না বলছ, রীতিমত বড় একটি চাকরি করতে শুধু হঠাৎ একদিন মাত্র একটু মন খারাপ হয়ে গেল বলে—

কৌশিক মাথা নিচু করে অন্যমনা গলায় বলল, কি জানি 'হঠাৎ একদিনই' কি না।

তবু তাদের দিকটাও তো দেখতে হবে বাবা। এভাবে চিরতরে হারিয়ে যাবে? না না—

কত মানুষই তো এমন হারিয়ে যায় ডাক্তার ব্যানার্জি। আপনার স্বামীজী মহারাজেরাও তো কোন একদিন কোন ঘর থেকে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

তো হোক, তা হোক।

ভারী চঞ্চল দেখাল ডাক্তারকে।

বললেন, আমি জানিয়ে দেব। চিঠি লিখে—না না টেলিগ্রাম করে দেব। তাই বা কেন? আমি তো তোমায় নিয়েই যেতে পারি সঙ্গে

করে। তারপর হঠাৎ জোরে হেসে উঠলেন। ভয় নেই পুরস্কারের টাকাটা ক্লেম করব না।

হাসতেই লাগলেন, যেন বাড়তি অনেকক্ষণ ধরে।

আর সীমা হাসির মধ্যেই খুব কড়া গলায় বলে উঠল, তুমি যাবে বলছ কী করে বাবা, তোমার রুগীরা নেই?

সীমা কেন কড়া হলো?

॥ ছাব্বিশ ॥

কৌশিক যেন বিভ্রান্তের মত তাকাল।

আর কেউ আসেনি? শুধু তোমরা?

আরও কাকে কাকে দরকার ছিল? জানতাম না—

উৎপলার চেহারা অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে, তবু উৎপলা মুখটা এখনো তেমনি লাল টকটকে হয়ে ওঠে অপছন্দর কথায়।

তাকিয়ে দেখল কৌশিক।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করল।

যেন চোখের সামনে এমন একটা নাটক অভিনয় হচ্ছে, যে নাটকে কৌশিকের কোন ভূমিকা নেই।

তাকিয়ে দেখল উৎপলাও।

মাসখানেক আগে দেখলে হয়তো উৎপলার স্বামীকে দেখে চোখে জল এসে যেত, প্রাণ হু হু করে উঠত, এখন করল না। হৃত লাবণ্যের পুনরুদ্ধার হয়েছে কৌশিকের।

হু হু করে উঠল না বলেই বোধ হয় ধু ধু করে উঠল।

সীমা চা আর খাবার দিয়ে যাবার পর কৌশিকের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বেশ তো ভালই ছিলে দেখতে পাচ্ছি। কন্বমুনির আশ্রম, শকুন্তলাও উপস্থিত।

কৌশিক চুপ করে দেখতে লাগল তার চিরপরিচিত দুটো মানুষকে।

কিন্তু উৎপলাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে?

দীর্ঘ একটা বছর কী অবর্ণনীয় মন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে তার সেই

জানে। আর যখনি ভেবেছে একটা লোক ইচ্ছে করে তাকে এই কষ্টটা দিচ্ছে, তখনি অগ্নিদাহ হয়েছে।

ক্রমশ আশা ছেড়ে দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কে জানে শেষ অবধি চরম কিছুই ঘটে গেছে কি না। বেঁচে থাকলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেও ( ) একটা চিঠি দেওয়া যায়।

হালছাড়া আশাছাড়া অবস্থার মুহূর্তে এই সংবাদ। 'এখানে পাওয়া যাবে কৌশিক গাঙ্গুলীকে।'

দক্ষিণ ভারতের একটা মিশন হসপিটালের ঠিকানা। তার মানে শেষ অবস্থা। হঠাৎ হয়তো বিবেকের তাড়নায় শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে। কে জানে কেউ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে তুলে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে গেছে কিনা। সেই মনোভাব নিয়ে ছুটে এসেছে উৎপলা প্লেনে করে।

আবার সন্দেহও ছিল আদৌ সত্যি কিনা খবরটা। শুধু 'পুরস্কারের প্রয়োজন নাই' টেলিগ্রামে এই কথাটা থাকার জন্যেই একটু নিশ্চিন্ততা ছিল।

কিন্তু এসে যদি দেখে, সেই কমনীয় কান্তি, সেই ঝকঝকে মুখ, সেই দীর্ঘোন্নত শরীর, কোথাও কোনো কষ্টের ছাপ নেই, তাহলেও কি উৎপলা এতদিন পরে স্বামীকে পেলাম বলে আছড়ে লুটিয়ে পড়বে?

অভিমানে কঠিন হয়ে থাকবে না?

তার সঙ্গে সীমার উপস্থিতি।

আরও কাকে কাকে দরকার ছিল? জানতাম না—

না উৎপলাকে দোষ দেওয়া যায় না।

'পুরস্কারেরই যদি প্রয়োজন নেই' তো খবর দিয়ে টেনে আনানোর দরকার কী ছিল? দয়া করে নিজেই তো চলে যাওয়া যেত।

কৌশিক নিশ্চুপ। তার তো এ নাটকে কোনো ভূমিকা নেই দেখা যাচ্ছে!

এই ছেলে।

ডাক্তার ব্যানার্জি আক্ষেপের গলায় বললেন, আহা! তোমার মনটা বাবা খুব শক্ত।

বলে নিজে চশমাটা খুলে মুছতে লাগলেন।

ভাবলেন, ছেলেরও মন শক্ত। কই 'বাবা' বলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল না তো। বললেন, কই দাদু, বাবাকে প্রণাম করলে না।

টুবাই আত্মস্থ গলায় বলল, আমি কাউকে প্রণাম করি না।

॥ সাতাশ ॥

ডাক্তার বললেন, আমরা তোমায় এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি কৌশিক।

সীমা খুব শান্ত গলায় বলল. আমরা কেন বাবা। তুমি গেলেই তো হল।

তুই যাবি না?

কী দরকার? এখানে কত কাজ। যেতে আসতে পুরো দিনটাই চলে যাবে।

ফাঁক পাবার উপায় রাখেনি, তবু চকিতে একবার সীমার মুখোমুখি। তাড়িয়েই দিলেন তাহলে?

উত্তরটা শোনার অবকাশ হল না।

॥ আঠাশ ॥

আবার কলকাতা। আবার ট্যাক্সি।

আকাশ যানে নৈঃশব্দের ভূমিকা।

টিকিট নম্বরেও দূরত্ব ছিল। মিশনের 'কোটা' থেকেই এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হল। স্বামীজীরা সর্বদা আসছেন যাচ্ছেন।

কৌশিকের মনে হল সেভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলাম না তো।

সারাক্ষণই নিজেকে 'পুতুল মানুষ' মনে হচ্ছিল বলে!

করণীয় কিছু নেই বলে?

ট্যাক্সিতে চড়ে বসার পর উৎপলা বলল, বাকি সারাজীবন আমাকে

এই ধাঁধাটার উত্তর ভাবতে হবে।

আর টুবাই মিটি-মিটি হেসে বলে উঠল, তুমি কী ডেঞ্জারাস লোক বাপী! আর কী দারুণ চালাক। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে যত পেরেছ টাকা তুলে নিয়ে গেছ! হি হি হি।···

টুবাইয়ের পাশের একটা দাঁতের জায়গা ফাঁকা ছিল, এখন সামনের দু-দুটো দাঁতের জায়গা ফাঁকা হয়ে রয়েছে। টুবাইয়ের মুখটা হঠাৎ অন্য কোন ছেলের মত দেখতে লাগল। না কি অন্য কোন প্রাণীর মত?

দিদিকে খবর দিয়েছিলে?

উৎপলা বিরক্ত গলায় বলল, খবর-টবর কাউকেই দিইনি। সত্যি কি না ঠিক নেই –

বাড়ি পৌঁছেই একটা ফোন করে দিও।

ফোন খারাপ চলছে।

দাঁড়াও, আমি একবার নেমে কোনোখান থেকে একটা ফোন করে আসি। ওই যে ডিসপেনসারিটা দেখছি—

কী আশ্চর্য! এই মুহূর্তেই না হলে হবে না?

কৌশিক একটু তাকিয়ে দেখে বলল, না। এই মুহূর্তেই না হলে হবে না।

ট্যাক্সি একটু পাশ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কৌশিক দ্রুতপায়ে নেমে পড়ল।

তারপর?

তারপর আবার কীভাবে যেন কোন পাশ দিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার জনারণ্যে মিশে গেল।

পিছনে ওরা অপেক্ষা করবে?

করুক, উপায় কী!

ছাঁচে ঢুকে পড়লে, আবার ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসা যাবে না। অথচ আসতেই হবে।

এখন আর কৌশিকের হাতে সেই অ্যারিস্টোক্র্যাট ব্রীফকেসটা নেই। নেই মোটা গোছার টাকা ভরা। পকেটে একটা রুমাল ছাড়া আর কিছু নেই।

তবু কৌশিক দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। মোড় ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে।

মেক আপ

কিছুক্ষণ আগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে।

খবরটা দিগ্বিদিকে রটে গেল।

সংবাদপত্রে, বেতারে, এবং টেলিভিশানে তড়িঘড়ি প্রচার করা হয়েছে। উনি যে বলতেন, 'জ্ঞান' আর 'বিজ্ঞান' উভয়েই ভগবান। 'জ্ঞান' যদি নির্গুণ ব্রহ্ম, তো বিজ্ঞান সগুণ ঈশ্বর, এটা ঠিক। নিছক শৌখিন উপমা প্রয়োগের বিলাস নয়। বিজ্ঞানের বলেই না আজ প্রচার যন্ত্রের এতো উন্নতি। আর সেই উন্নতির বলেই না বঙ্গভূমির একান্তে এই ক্ষুদ্র নিমপুর গ্রামের অনন্ত আশ্রমের এই মুহূর্তের ঘটনার খবরটি সারা ভারতে পৌঁছে গেল।

অবশ্য বহু বড় বড় লোক উপস্থিত থাকায় এবং তা বড় বড় সব সাংবাদিকরা থাকায়, প্রচারের ব্যাপারটা এত সহজে আর সুশৃঙ্খলে হতে পারল। এঁদের মধ্যে অনেকেই তো আবার ব্যাকুল চিত্তে ছুটে এসেছেন হাহাকার ভরা মন নিয়ে। এঁরাই এত তড়িঘড়ির ব্যবস্থাটা করে দিতে সক্ষম হলেন। নইলে শুধু 'অনন্ত আশ্রমের' আশ্রমবাসীরা আর কতটুকু কী করে তুলতে পারতেন?

আশ্রমজননী, 'দেবীমা'!

তিনিও তো এখন স্থির থাকবার চেষ্টা করলেও অস্থির হচ্ছেন, উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছেন।

ক'দিন ধরেই এই রকম খবরের প্রস্তুতি চলছিল। এবেলা ওবেলার অবস্থা কাগজের অফিসে, বেতারে, টি, ভি.-তে জানানো হচ্ছিল আর ওঁর অগণিত ভক্ত 'কী হয় কী হয়', করে স্পন্দিত হয়ে থেকেছিল। সে স্পন্দনের শেষ হল। জানতে পারল ওই বিজ্ঞানের দৌলতেই গত রাত্রি থেকে 'অক্সিজেন' দিয়ে দিয়ে যে প্রাণ স্পন্দনটুকু টিকিয়ে রাখা হচ্ছিল, তা' জবাব দিল।

উনি মারা গেলেন। না না, দেহরক্ষা করলেন। নাকের দু'পাশে আর রাগের নীচে যে 'টেপ'-এর টুকরোগুলো সাঁটা ছিল, সেগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, যান্ত্রিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ভাঁড়ারটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন ওঁর মুখ পরিষ্কার প্রশান্ত।

অগণিত ভক্তের অশ্রুজল নিশ্চয়ই ওঁর মহাযাত্রার পথ ধৌত করে *দিচ্ছে, অগণিত ভক্তের হাহাকার হয়তো বা ওঁকে সেই যাত্রাপথেও* সচকিত করে তুলছে। 'নিমপুর অনন্ত আশ্রমের' চত্বরেই শুধু নয়, সারা নিমপুর গ্রামই আজ ভীড়ে ভীড়াকার। রেলগাড়িতে, বাসে, সাইকেল রিক্সায়, পায়ে হেঁটে, সকাল থেকে আর লোক আসার বিরাম নেই।

একবার শেষ দেখা দেখবে, এই বাসনা নিয়ে সকলের ছুটে আসা।

ভোরের দিকে যারা এসেছে, তাদের হয়তো সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। জানলার বাইরে থেকে নাকে নল লাগানো সেই জ্ঞানহীন স্মৃতিটিকে দেখেই তারা 'তবু তো দেখা পেলাম' এই সান্ত্বনা নিয়ে বাইরে গিয়ে বসেছে। সকাল সাতটার পরে আসা ভক্তদের আর সে সন্তোষ লাভের সুযোগ হল না।

কয়েকজন মহিলা, 'বাবা একটুর জন্যে দেখা দিলে না?' বলে আছড়ে পড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় তাঁদেরকে আশ্রম সংলগ্ন 'সেবা-ভবনে" নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুরুষেরা এখানে সেখানে গাছতলায় নাটমন্দিরের চাতালে বসে পড়েছেন কপালে হাত দিয়ে। কপালে হাত তো দিতেও হবে, প্রচণ্ড রোদ! আজ যেন সকাল থেকেই দুর্দান্তভাবে চড়ে উঠেছে। আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানের সময় যে সব বড় বড় মাটির জালাগুলো বার করা হয় সমাগত জনেদের জল বিতরণের জন্যে, সেই জালাগুলো বার করে ফেলা হয়েছে। এবং আশ্রমের টিউব ওয়েল থেকে পাম্পে জল উঠে উঠে তাদের ভর্তি রাখছে। নিমপুর গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না, বোধকরি প্রকল্পের তেমন পরিকল্পনাও ছিল না, 'ঠাকুর' যখন এখানে এসে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, নেহাৎই গ্রামীন পরিবেশে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমের নিজস্ব জেনারেটারে চারিদিক আলোকিত করে তুলেছিলেন, আর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে আশ্রমবাসীদের পুলকিত করে ফেলেছিলেন। অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুসারে এবং তাঁর যত সব বড় বড় ভক্তদের আপ্রাণ চেষ্টায় নিমপুরে বিদ্যুৎ এসে

গেছে। স্টেশন থেকে আশ্রম পর্যন্ত আলোর মালা, আশ্রমের প্রতিটি ব্যাপারই প্রায় এখন বিদ্যুৎ-চালিত। আর পুরনো বসিন্দাদের মধ্যে যাদের অবস্থায় কুলিয়েছে, তারা এই সুবিধেটি আহরণ করে নিয়েছে। আর ঠাকুরের জয়গান করেছে।

অবশ্য চিরন্তন নিয়ম অনুসারে নিমপুর গ্রামে বিরোধীপক্ষও আছে কিছু কিছু। তারা ঠাকুরের নামে নানাখানা সমালোচনা করে, ভণ্ড বলে অভিহিত করে এবং 'উৎসব' ইত্যাদিতে জন সমাগমের বহর দেখলে মুখ বাঁকায়, আর ব্যাপারটা গাঁয়ের জিনিসপত্র আক্রা করে দিচ্ছে বলে রাগারাগি করে।

তা আক্রা তো হয়ই।

ব-সরের তিনটি প্রধান উৎসবেই ক'দিন আগে থেকে তরিতরকারি সব্জিওয়ালাদের মধ্যে থেকে টেণ্ডার ডাকা হয়, এবং গাড়ি গাড়ি জিনিস এসে পড়তে থাকে। টেণ্ডার ডাকা হয় গোয়ালাদের মধ্যে থেকেও। বিগ্রহের দই ক্ষীর ছানা ব্যতীতও, চায়ের জন্যেও তো কম দুধ লাগে না। তার সঙ্গে গুঁড়ো দুধেরও জোগান চলে।

বিশেষ করে মাঘী পূর্ণিমায়। যেটা বছরের প্রধান উৎসব। ঠাকুরের জন্মদিন। হাজার হাজার ভক্ত, আর তিনদিন ব্যাপী সমারোহ। শিষ্য সামন্ত চেলা চামুণ্ডার অভাব না থাকলেও, ঠাকুর নিজেই সব তদারক করে বেড়ান, তদুপরি আছেন দেবীমা। বলতে গেলে সর্বোপরি।

সব কিছু নিজে দেখেও ঠাকুর বলেন, 'তোমাদের দেবীমার কাছে যাও। তিনি যা বলবেন।'

জন্মদিন, জন্মাষ্টমী, আর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস।

সারা বছরে এই প্রধান তিনটি উৎসবেই ঠাকুরের আর দেবীমার নিমপুরে পদার্পণ। দিন কয়েক আগে আসেন, দিন কয়েক পরে চলে যান। চলে যাবার সময় স্থানীয় ভক্তেরা 'মা মা' 'বাবা বাবা' করে স্টেশন পর্যন্ত ছোটে, আর অকুল প্রশ্নে পথ মুখরিত করে তোলে, 'বাবা আবার কবে দেখা পাব? মা আবার কবে দেখা পাব' রবে।

মা আশীর্ঝদী ফুল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর ছিটোতে ছিটোতে চলেন।

কিন্তু এখন তো আর 'করেন, বলেন' 'ছড়ান ছিটোন,' ইত্যাদি পুরনো শব্দগুলো ব্যবহার করা চলবে না। এখন অতীতসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। 'করতেন বলতেন।'

ঠাকুর অতীত কালের সামিল হয়ে গেলেন।

'মা' ই কি আর থাকবেন ?

এখনি সেই প্রশ্ন গুঞ্জরিত।

'ঠাকুরের' সঙ্গে যে মার জীবন বাঁধা।

আবার আশাবাদীরা বলছে, 'থাকবেন না বললে চলবে কেন ? থাকতেই হবে। আমাদের জন্যে, দেশের জন্য, দশের জন্যে। ঠাকুরের আরদ্ধ কাজ শেষ করতে।'

তাই তো! ঠিকই তো। ঠাকুর রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর মা সারদাদেবীকে থাকতে হয়নি? শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীমাকে?

তাহলে এই একটা আশ্রমে ভক্তরা ভাঙা প্রাণ জোড়া লাগাতে পারবে। যদিও ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত সেই মহান দেবদেহের পায়ের কাছে বসে থাকা নিথর নিস্পন্দ 'দেবীমা'কে দেখলে তাঁরও 'তিরোধানে'র সম্পর্কিত প্রশ্নটা অযৌক্তিকই মনে হবে। অটুট স্বাস্থ্য অনবদ্য।

অত্যুজ্জ্বল দেবীমূর্তির মতই বসে আছেন তিনি। দর্শকবৃন্দের মনে হচ্ছে ক্রমশঃই যেন উত্তরোত্তর জ্যোতি ফুটে উঠেছে তাঁর মধ্যে থেকে। বুঝি বা একটু পরেই মাথার চারপাশ ঘিরে জ্যোতির্বলয় দেখা দেবে।

যেমন হচ্ছে শবদেহেরও। রোগক্লিষ্ট, আর মৃত্যুদীণ মুখের কালিমা ক্রমেই অপসারিত হয়ে যাচ্ছে, চামড়াটা টানটান হয়ে গিয়ে দিব্য বিভায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে।

এই অলৌকিক দৃশ্যে বাইরে, বাগানে, গাছতলায়, ভক্তদের জটলার মধ্যে বিগলিত আলোচনা চলছে। দেখছেন দাদা ? ক্রমশঃই কী রকম জ্যোতি ফুটে উঠেছে। মহাপুরুষের লক্ষণই এই।

তবে বিরোধী পক্ষেরও কেউ কেউ এসে হাজির হয়েছে বৈকি।

শোকাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে নয়, কৌতূহল-আক্রান্ত হয়ে, বেড়াতে বেড়াতে। তাদের মধ্যেই একজন বলে উঠল, 'মৃত্যুর পর এরকম হয়। এইতো সিদিনকে, আমার জ্যাঠা গেল। চোখের সামনে দেখলাম তামাটে রংটা সেই আগের মতন গৌরবর্ণ হয়ে গেল। কপালের কুচুটে রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে প্লেন হয়ে গেল, সদাবেজার মুখটা যেন হাসি হাসি হয়ে গেল। অথচ লোক তো বিশেষ সুবিধের ছিল না। মহাজনী কারবার করে কতজনকে পথে বসিয়েছেন।' এই শ্রদ্ধাহীন দুর্মুখ লোকটার দিকে অনেকেই বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। যেন এটা আবার এখানে কেন? এ'কে পারমিশান দিয়েছে এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে?

একজন নিষ্ঠাশীল ভক্ত বলেই উঠল, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না?

ভদ্রলোক একটু উচ্ছ্বাসের হাসি হেসে বললেন, কে কাকে চিনতে পারে দাদা? এই জগৎটা তো হচ্ছে চেনা অচেনার লুকোচুরি খেলা!

ভক্ত চমকে উঠল।

এ কথাটি তো ঠাকুরের কথা। তাঁর 'উপদেশ শতক'এ আছে। তার মানে পড়েছে সে বই এই লোকটা। অথচ নাস্তিকের মত ভঙ্গী।

তার মানে সেই 'অমৃত বাণী'-কে ব্যঙ্গ করে 'কোট্' করল।

না কি নাস্তিকের ছদ্মবেশ?

অনেক সময় এমনও দেখা যায়।

প্রশ্নকর্তা অতএব কিঞ্চিৎ নম্র হল। বলল, আপনি কি ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য? না—

কথাটা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, না মশাই, শিষ্য টিষ্য নই। এমনি এসেছি। আমি এখানকার সাতপুরুষের বাসিন্দে। আপনাদের ঠাকুর এখানে আশ্রম স্থাপন করায় গ্রামটার খুব বোলবোলাও হয়ে গেছে। সেটাই লাভ। জমিদারী তো আরো বাড়াচ্ছিলেন, শুনতে পাই নিমপুর লাগোয়া 'কলসীভাঙা' গাঁটাও কেনার কথা চলছিল। 'জমিদারী বাড়াচ্ছিলেন' শুনেই বারুদে আগুন ধরে যায়, মারমুখী

জনতা তাকে আশ্রম এলাকা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে 'রে রে' করে ওঠে, লোকটা সরে পড়ে। নেহাৎ এখনো মন্দির প্রাঙ্গণে শবদেহ শায়িত, টেলিভিশানের ফটোগ্রাফারদের আসার অপেক্ষায়। ভক্তবৃন্দ সমবেত ভাবে তালপাতার পাখা নিয়ে সামনে বাতাস করে চলেছে, তাই ব্যাপারটা বেশীদূর এগোতে পারল না। নচেৎ একখানা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না।

কিন্তু উনি কি এসব চেয়েছিলেন ?

এই মাত্রাতিরিক্ত প্রচার? যিনি এখন ফুলে ঢাকা হয়ে পড়ে রয়েছেন।

তা, তিনি তো এখন সবকিছু চাওয়া না চাওয়ার বাইরে, এখন ভক্তিমত্ত ভক্তরা কী করছে না করছে দেখতে আসছেন না। ঠেকাতেও পারবেন না। তবে যখন জলজ্যান্ত জীবিত ছিলেন ? তখনই কি ঠেকাতে পারতেন ?

তাঁর শত নিষেধ, শত শাসনবাণী উপেক্ষা করেও ভক্ত শিষ্যরা আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত প্রচার যন্ত্রগুলি কি কাজে লাগাত না 'ঠাকুর' বাবদ ?

তারা না ছোড়। এমনও হয়েছে তিনি এদের অসাক্ষাতে বলেছেন, 'দেবীজী' এদের উৎপাতে তো জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঠেকাবার উপায়টা কী বলতে পারো ?

দেবীজী মুখে একটু অলৌকিক হাসি ফুটিয়ে তুলে বলেছেন, পারি। তৈলঙ্গস্বামী বামাক্ষ্যাপার মত যথেচ্ছ গালমন্দ, কিংবা কাঠিয়া বাবাদের মত চিমটে নিয়ে তেড়ে আসা।

ঠাকুরের হতাশ উক্তি, তা সেটা তো আর সম্ভব নয়।

তবে আর এদের হাত এড়ানোও সম্ভব নয়। এক সময় তো আরব্য উপন্যাস ট্যাস পড়েছিলেন ? জনেন তো কলসী থেকে দৈত্যকে একবার বার করে বসলে আর তাকে কলসীর মধ্যে ঢোকানো যায় না। তাকে চিরজীবন কাঁধে করে বয়ে নিয়েই বেড়াতে হয়। ছাড়ান নেই।

তা' সেই 'ছাড়ান না থাকার' ফলশ্রুতিতেই 'জমিদারী বাড়ানোর' পরিকল্পনা।

এই এক বিপুল সংখ্যক জনসমাজকে তো আর অধ্যাত্ম পথের টিকিট জোগাড় করে দেওয়া সম্ভব নয়। সে সম্বলের প্রশ্নও নেই। অতএব 'জনসেবা'।

সেবামূলক কর্মের মধ্য দিয়েই গ্রামোন্নয়ন অথবা গ্রামোন্নয়নের মধ্যে দিয়েই সেবাকর্মের বা সেবাধর্মের প্রসার। এ থেকে অনেক দুঃস্থজনের বেকারত্বও ঘুচছে। অনেক গরীব সহায় সাহায্য পাচ্ছে। পরিকল্পনা ছিল ওই 'কলসীভাঙা' গ্রামের অনেকখানিটা অধিগ্রহণ করে নিমপুরের মতই প্রাথমিক স্কুল, হাসপাতাল, প্রতিবন্ধী আগার ইত্যাদি গড়ে তুলবেন। এবং তুলবেন একটু বড় স্কেলেই।

একটা ছোট খাটো প্রেস করবারও ইচ্ছে ছিল। কারণ 'আশ্রম পুস্তিকাগুলি' প্রকাশের জন্যে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়, সময় এবং পয়সা দুই বেশী লাগে। ওই পুস্তিকাগুলিও আশ্রমের একটা আয়, উৎসবের সময় কিছু অর্থ মূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রতিবারই 'নতুন বাণী'র জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে লোকে। গ্রন্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিষ্য মুকুন্দ এখনি ভাবতে শুরু করছে ঠাকুরের 'তিরোভাব উৎসবের' দিন ওঁর গ্রন্থরাজি কিভাবে 'বিতরণ' করতে পারা যাবে। কিছু কিছু তো আউট অফ্ প্রিন্ট। এই কদিনের মধ্যে কি ছাপিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে? হতে পারলে বড়ই ভাল হয়। এইটাই হয়তো শেষ সুযোগ। এরপর কি আর অমনভাবে হাজার হাজার জন একত্র হবে?

ক্রমশঃ বেলা বাড়ছে ফুলের মালাগুলি শুকিয়ে উঠেছে। হরিনাম সংকীর্তনের করুণ সুর, যেটা নাকি ওঁর নির্দেশে মৃত্যুর পূর্বথেকেই সমস্ত পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটা মাঝে মাঝেই স্তিমিত হয়ে আসছে। কিন্তু গতরাত্রি থেকেই তো উনি বাকশক্তি রহিত। নির্দেশটা দিলেন কখন?

কী আশ্চর্য। জ্ঞানীগুণী জনেরা কি কখনও কোন কাজের জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন?

মূঢ় সংসারীদের মত যেন, চিরকাল বাঁচব, এই ধারণায় আশী বছরেও মৃত্যুকালে আক্ষেপে অস্থির হবেন 'উইলটা' করা হল না বলে? উইল

না করে মরলেই তো, মেয়েগুলো ছেলেগুলোর সঙ্গে সমান অংশীদার হয়ে বসবে! এটা আক্ষেপের বিষয় বৈকি। তবু আশী বছরটাক আয়ু পেয়েও কর্ম সমাধা হয়ে ওঠে না।

এঁরা সব কিছুই আগে থেকে ভাবেন, আগে থেকে করেন। তাই আগে থেকে নির্দেশ ছিল, আমার মৃত্যুকাল আসন্ন হলেই নাম গান করবি তোরা। আর যতক্ষণ না চিতার আগুন নির্বাপিত হবে ততক্ষণ চালিয়ে যাবি।

শক্ত পোক্ত বলিষ্ঠ সুস্থ মানুষটার মুখে একথা শুনে ভক্তরা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, এ কী কথা ঠাকুর! এমন অকল্যাণের কথা কেন?

ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, আরে বাবা দেহটা তো কাঁচা মাটির? একদিন তো তার বিনাশ আছে? 'নেই' বললে তো চলবে না। তা আগে থেকেই বলে রাখছি। যাত্রাকালে যেন নাম শুনতে শুনতে যেতে পারি। তা' সে তো কতদিন আগের কথা! তবু অনুরাগী ভক্তজনেরা মনে রেখেছে। ডাক্তার যখন নাক থেকে নলটা সরিয়ে দেবার ইসারা করল, তখনই শুরু হয়ে গেল সেই নামগান। ওই গানের সুরে আচ্ছন্ন পাথরের বেদীর মত বসে থাকা দেবীজীর কি মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই সেদিন, নিরালা পেলে তীব্র ব্যঙ্গে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন তিনি, 'মরণকালেও ভাবমূর্তিটি বজায় রাখার চেষ্টায় ঘুম হচ্ছে না?'

কে জানে এখন মনে পড়ছে কিনা। তবে বলেছিলেন, আরো বলেছিলেন, ফাঁকির কারবার চালাতে চালাতে ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় না আপনার?

অনন্তানন্দ বলেছিলেন, বুঝতে পারি না। এই ফাঁকিটাই ঠাশবুনুনি হয়ে ভেতরটা সলিড্ করে রেখেছে কি না কে জানে!

'দেবীজী' হিসহিসিয়ে উঠেছিলেন।

ইচ্ছে করে আপনার এই ঠাশবুনুনি একদিন ছিঁড়ে খুঁড়ে ছড়িয়ে দিই। মুখোসটা খুলে ফেলে দিয়ে বলি, এই ছাখো তোমরা, আসল মানুষটাকে ছাখো। ওর যে সাজটা তোমরা সোনার ভেবে মোহিত হয়ে আছো সেগুলো স্রেফ রাংতার।

উনি বেদনাবিদ্ধ একটু হেসে বলেছিলেন, তা অবশ্য পারো তুমি। হাতে সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু তোমার আসনটাও তো তাহলে টলে যাবে দেবী?

যাক। চুলোয় যাক! এই মিথ্যের আসনে বসে থাকতে পারছি না আর। পারছি না এই ভক্তি প্রণাম কুড়োতে।

দেবী! আমি মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?

কে আগে মরে ঠিক আছে? হয়তো হাতচ্ছাড়ি দেবীকেই এই মিথ্যের সিংহাসনে বসে থাকতে থাকতে মরতে হতে পারে। কোন সম্বল নিয়ে যাবে তাহলে সে?

অনন্তানন্দজী ভয় ভয় মুখে বলেছেন, আমি এসব ভাবতে যাই না দেবী! আমি শুধু ওই অবোধ মানুষগুলোর মুখগুলো ভাবি। মায়া হয়।

আবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছিল দেবীজীর চোখে। ক্ষণেক্ষণেই এমন ঝলসায়। ভক্তবৃন্দের মাঝখানে ঠাকুর যখন 'মহৎবাণী' বিতরণ করেন তখন।

সমাগত জনেদের চোখে পড়লে তারা শিহরিত হয়। বলাবলি করে, দেখেছিলেন তখন? দেবীমার চোখ? দিব্য অগ্নি ঝলসে উঠেছিল। উনিও অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন। কী আশ্চর্য! যাবেন না মানে? দু'জনে কি আলাদা? লীলাসঙ্গী রূপেই তো এসেছেন। যুগে যুগে তো এই ঘটনাই ঘটে।

এসব কথা কি টের পেতেন না 'দেবীমা'।

কিন্তু এখন কি এসব কথা মনে পড়ছে ওঁর?

এখনো তো নিজেরও সেই ভাবমূর্তিটি বজায় রাখতে আসনে প্রস্তর প্রতিমার মত বসে আছেন।

না কি এখন তিনি ওই বিশাল ফুলের বোঝার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছেন 'মিথ্যে' জিনিসটা থেকেও এমন ফুল ফুটতে পারে? কী করে তবে বোঝা যাবে কোন্ ফুলটার জন্ম মালির বাগানে, আর কোন্‌টার পাঁকে?

নামগানের তলায় তলায় আড়ালে নানা কথাও চলছে, চলছে বিস্ময়োক্তিও। কি আশ্চয্যি! অবাক লাগছে—সারা বছরে সারা ভারতের কত কত বিখ্যাত জায়গায় থাকছেন, আর শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে এলেন এই নিমপুরে।

কি জানি এখানে ওঁর কী ছিল! এত জায়গা থাকতে এখানেই আশ্রম বানাতে এসেছিলেন কেন!

জন্মস্থান নয় তো?

না না। স্থানীয় লোকেরা তো তা হলে কিছু জানতো।

কি করে জানবে? ওঁর বয়সের কেউ আছে এখানে? শুনতে পাই একশো পাঁচ বছর বয়েস। উনি অবশ্য মানেন না, বললে হেসে উড়িয়ে দেন!

দেখলে কে বলবে? মনে হয় বুঝি পঞ্চাশও হয়নি।

তবে আর সাধনা কিসের? হরিদ্বারে তিন চারশো বছরের সাধুরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখেছি।

দেবীমারই বা কত কে জানে? ঠাকুরতো হেসে হেসে বলেছেন, তাদের 'দেবীমা' চিরকিশোরী রাইকিশোরী। শুনে ভক্তরা আহ্লাদে বিগলিত হয়েছে। বলেছে, যা বলেছেন বাবা। যতদিন দেখছি—একই রকম।

তা' ঠাকুর এদের কাছে এদের মত হয়ে গিয়ে ঘরোয়া পরিহাসও করেছেন বৈ কি। বলেছেন হুঁ! তোদের দেবীমা যে পাকাহত্তুকি খেয়ে রেখেছে।

এই সহজতা ওদের আরো মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু প্রসঙ্গের বিষয়বস্তুটি? তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, রুষ্ট হয়েছেন, রুদ্ধকণ্ঠ হয়েছেন এবং সেই নিভৃত নিরালায় যখন একা পেয়েছেন, ফেটে পড়ে বলেছেন, লজ্জা করে না আপনার, লজ্জা করে না? ওদের সামনে ওই ভাবে কথা বলতে লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, ভয় নেই! আশ্চর্য! আশ্চর্য!

অনন্তানন্দ তাকিয়াটা কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেশে চোখ বুজে

বলেছেন, জানোই তো সাধনার সাফল্য ঘৃণা নিন্দা, ভয় তিন থাকতে নয়।

সাধনা ?

তা' এও একরকম সাধনা নয় কি দেবী ? যার সর্বাঙ্গে এখনো মারের দাগ, তার পায়ে হাজার হাজার মানুষের ফুল চন্দন। তবে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, এটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারো ?

দেবীমা তাঁর আলুলায়িত কেশরাশি হাতে জড়িয়ে টাইট করে ফেলে বলে উঠলেন, যাত্রা থিয়েটারের সাজা রাজারাও মুকুট পরে সিংহাসনে বসে, প্রজারা কুর্নিশ করে।

'দাস অনন্তানন্দ' একটু মধুর মোহন হাসলেন।

হ্যাঁ 'দাস অনন্তানন্দ' এই নামেই তিনি নিজেকে পরিচিত করেন। 'স্বামীজী টামীজীর' দিকে যাননি। কেউ যদি বলে ফেলে, উনি বলে ওঠেন, 'স্বামীজী' কি বল ? অ্যাঁ ? যাহোক একটা বলে বসলেই হল ?

তবে ওরা 'ঠাকুর' বলে। তাতে আপত্তি করেন না। হেসে হেসে বলেন, তা বলবি বল। গেরস্থ বাড়িতে রাঁধুনিকে বলে ঠাকুর, হালুইকরদের বলে ঠাকুর। এটাও তেমনি একটা। কিন্তু আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। 'বলেন নয়, বলতেন।'

যেমন সেদিন দেবীজীর কথার উত্তর হেসে বলেছিলেন, আসল জায়গাটাতে কিন্তু ভুল করছ দেবী। যাত্রা থিয়েটারের প্রজারাও সাজা মানুষ। প্রজার মেকআপ নিয়ে পেন্নাম ঠুকছে। কিন্তু এখানে ?

দেবীজী ওঁর পালঙ্কের ধারে বসে পড়ে বললেন, আচ্ছা আপনার ভয় করে না ?

হ্যাঁ পালঙ্ক আছে বৈ কি। ভক্তদের আকুল প্রাণের উপহার কী অবহেলা করা যায় ? পালিশ করা পালঙ্ক, শাটিনের বিছানা, নাইলনের মশারি সবই গ্রহণ করতে হয় হয়েছে। আশ্রমের দোতলায় ওঁর সাধন ঘর যেখানে উনি সারারাত সাধন ভজনে থাকেন। কারো প্রবেশাধিকার নেই। দেবীমা বাদে। তিনি পাশের ছোট্ট ঘরটায় জেগে

বসে থাকেন, কখন ধ্যান সমাধি হয়ে বসে, কখন বা ভাব সমাধি।

দেবী বললেন, ভয় করে না আপনার? মনে হয় না, হঠাৎ যদি খসে পড়ে এই মুখোশ! কী অবস্থা ঘটবে আপনার?

মনে আনি না। ভাবি যা হয় হবে। হয়তো এবারে আর শুধু সর্বাঙ্গে মারের দাগটা নিয়ে পালানো সম্ভব হবে না। এখন শুনি গণধোলাই বলে একটা প্যাটার্ন চালু হয়েছে।

আমি কিন্তু ভাবি। ভাবা কেন, না ভেবেও চোখের সামনে দেখতে পাই হঠাৎ একদিন উন্মত্ত জনতা আপনাকে আর আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

উনি আবার হাসলেন।

সেই মধুর দেবদুর্লভ হাসি। যেটা ওঁর ঈশ্বরদত্ত ঐশ্বর্য। যে হাসির কাছে পরাস্ত না হয়ে উপায় নেই।

হাসলেন, বললেন, দু'জনকেই যখন তাহলে আর ভয় কী? দুজনেই একই স্বর্গে পৌঁছে যাবে।

স্বর্গে!

আচ্ছা না হয় নরকেই। মার খেয়ে মরাদের নরকে। তবু একই ঠাঁই তো?

উঃ। পূর্বজন্মে আমি আপনার কী শত্রুই ছিলাম।

মাত্র পূর্বজন্মে? এ জন্মে নয়? তুমি বোধহয় আমার জন্ম জন্মান্তরের শত্রু।

দেবী একটু নিঃশ্বাস ফেললেন। রুক্ষ চুলের মাথা হতে খোঁপাটা আবার খুলে পড়ল।

দেবী!

বলুন!

এখানেও তুমি আমায় আপনি বল কেন?

অভ্যাস হয়ে গেছে!

'আপনি' শুনলে মনে হয় যেন অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছ। না, না, দেবী অন্ততঃ এই সময়টুকু আমায় 'তুমি' করে কথা বল?

আগে ?

দেবী বোধহয় একটু হাসলেন, আগে তো আপনিই বলতাম।

ও! সে কবে! কত কতদিন যেন আগে। সে কথা ছেড়ে দাও। উঃ সাধুর মেক আপ চড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রাণ গেল। এখন একটু অসাধু হতে দাও দিকি।

একদিন কিন্তু এই মেকআপটাই প্রাণ বাঁচিয়েছিল. মনে পড়ে ?

তোমার মত সর্বদা এত অতীতকে তুলে তুলে দেখতে আমার ভাল লাগে না।

তবু—

দেবী আবার চুলটাকে বেশ টাইট করে বাঁধলেন। এখন কচি ডাবের মত নীটোল মাজা মাজা মুখটা যেন আবরণ মুক্ত হয়ে ঝলসে উঠল। যেন দেবীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচল। তবু তিনিও বলে উঠলেন, তবু মেকআপটার প্রতিও একটা কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।

সেই উচিতের দাসত্ব তো করেই চলেছি দেবী। মাঝে মাঝে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে।

শুধু তোমার ? আর কারো নয় ?

দেবীর চোখে আগুনের ফুলকি ঝল্‌সে ওঠে। কোন জীবনের আশ্বাস দিয়েছিলে তুমি আমায় আর কোন জীবনের মধ্যে এনে ফেলেছ।

উনিও একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাকিয়াটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা দেবী, এই জীবনটাই বা এমন কি মন্দ ?

কী ? কী বলছ ? এই ছদ্মদেশ! এই ভণ্ডামী! এই হাজার লোকের পুজো নেওয়া, আর এই বিশাল কর্মভার বিশাল দায়িত্ব অহরহ একটা সমারোহের ব্যবস্থা এতে গা ভাসিয়ে চলা, এটা তোমার মন্দ বলে মনে হয় না ? এখানে আমার আমিটা কোথায় ? ঠিক যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুজে অনিবার্যের পথে এগিয়ে চলেছি।

অনিবার্যটা যে কী তাও তো স্পষ্ট।

উনি উঠে বসলেন সিধে হয়ে।

সুঠাম সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, কাঁচা সোনার মত গায়ের রং, অনিন্দ্যমুখ। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত।

দেবীর পুড়ে মরার আগুন।

গায়ে একটা ফর্সা ফতুয়া। এখন ওটার অন্তরালে সেই দাগগুলো ঢাকা পড়ে আছে।

দেবী তাকিয়ে দেখলেন।

আচ্ছা আগে কি সেই লোকটার এমন কাঁচা সোনার মত রং ছিল? হ্যাঁ ফর্সা ছিল অবশ্যই, কিন্তু সে কি এমন? এটা কী করে হল? কবে, কখন? এমন ঔজ্জ্বল্য! এমন দীপ্তি।

দেবী টের পান না, তাঁর মধ্যেও এসেছে এটা। হয়তো 'ভেক'-এরও একটা শক্তি আছে। অথবা জীবন চর্চ্চার ভঙ্গীতে বদল ঘটে।

উনি উঠে বসে বললেন, মানুষ মাত্রেই তো নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে অনিবার্যর দিকে এগিয়ে চলেছে দেবী।

থাক। জ্ঞানবাণীটা বাজে খরচ করো না। এটা তোমার ভক্তমণ্ডলীর জন্যে রেখে দাও।

আবার সেই মনোহর হাসি।

আচ্ছা তবে 'অজ্ঞানে'র মত বাণীটাই কই? সরে এসো, মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।

দেবীর মুখে আবার তিক্ত ব্যঙ্গের ছুরি, যে লোক অহরহ দেশসুদ্ধর মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে, তার মাথায় হাত বোলানো? চমৎকার!

হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব চমৎকার! কী ঠাণ্ডা; কী নরম।

হাতটা ততক্ষণে টেনে নিয়ে কপালে রাখা হয়ে গেছে।

দেবী একটা গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস ফেললেন।

আশ্চর্য! বয়েসও কি বাড়ছে না?

তা হয়তো বাড়ছে।....অনুচ্চ একটি হা-হা হাসি, তবে একশো পাঁচে পৌঁছয়নি।

অনুচ্চ তো রাখতেই হবে, হাসির কথা।

হাসছ? হাসছ তুমি? হাসতে পারছ? ঠক্ জোচ্চোর বিশ্বাস-

ঘাতক। রাগে দুঃখে জ্বালায় ঠিক সেই জোচ্চোর লোকটার ওপরই আছড়ে পড়া।

দেবী! শুধু এই ক্ষণটুকুর জন্যেই মন সারাক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। হয়তো 'দেবী'র মোড়কে মোড়া একদার সেই কী যেন নামের মেয়েটারও তাই থাকে। তবু তার চেতনার মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে। কেন? কেন? যা অতি অখ্যাত অজ্ঞাত একটা সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে থেকেও পাওয়া যেত, যেখানে ভয়ের খাঁড়া উঁচোনো থাকত না, সেই জীবনে আশ্রয় না নিয়ে এই বৃহৎ একটা প্রতারণার জালের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া কেন? এখনও 'আর কেন' এর জের টেনে চলা।

দেবী তাই বলে ওঠেন, নাটুকে কথা থাক। আমি আর পারছি না। নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পাই আমি।

কিন্তু আমি তো কই পাই না।

দাস অনন্তানন্দের আশ্চর্য স্বীকারোক্তি, আমি তো বরং এতে বেশ কৌতুক অনুভব করি।

কৌতুক অনুভব করেন আপনি?

আঃ! আবার সেই 'আপনি।'

ঠিক আছে, ওই আপনি তুমিটা একটা প্রবলেম নয়। অবাক হচ্ছি শুনে, এই প্রতারণায় কৌতুক লাগে?

তা এক একসময় লাগে বৈকি। মনে হয় ছাখ ব্যাটা বুড়ধাকরা তোদের ঠাকুর কোন ভাবসমাধিতে বিভোর।

তুমি একটা শয়তান, একটা ইতর।

আহা সে প্রমাণ তো আগেই পাওয়া হয়ে গেছে। আমি তো আমায় ভদ্র বলে, মহাপুরুষ বলে দাবি করতে যাই না। লোকে আমায় 'ঠাকুর' বানাতে বসলে আমি কী করব?

তুমি আগে নিজেকে 'ঠাকুর' বানিয়ে বসে লোককে ঠকাতে বসেছিল।

প্রাণের দায়ে লোক ঠকানোটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তা লোকে যদি ঠকেই চলে, তার থেকে বেরিয়ে আসাও তো এক দুরূহ ব্যাপার। তার থেকে, যা চলছে চলুক না।

চলাচ্ছি আমি। মনে জেনো তোমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। দিনের পর দিন আমি লিখে চলেছি, লিখে চলেছি, এক মহামানবের মহত্ত্বের ইতিহাস। ছাপিয়ে বিলি করব। লিখে চলেছি। চলেছিই তো। একদিন দেখতে পাবে। অবশ্যই তার প্রতিক্রিয়াটাও দেখতে পাবে।

কিন্তু ভক্ত এমন একটা ভয়ানক আশ্চর্য জাতি দেবী তারা হয়তো তোমার অকাট্য প্রমাণ দাখিল সত্ত্বেও বিশ্বাস করবে না। বলবে এ ষড়যন্ত্র! এ পলিটিকস্। ঠাকুরকে হেয় করার চক্রান্ত। হয়তো বা তোমার ওই মুখোস খুলে দেওয়াটা আমার অনকূলেই এসে যাবে। বেশী করে পাবলিশিটি পেয়ে যাব।

তবু হয়ে ওঠে না মুখোস খোলা।

দাস অনন্তানন্দ যখন যেখানেই থাকুন ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে জীবনচর্চা একই ভঙ্গীতে চলে।

বাঙালী অবাঙালী কত ভক্তশিষ্য তাঁর। এবং 'বড় বড় শিষ্য।' ঠাকুর তাদের আশ্রয়ে দু' চারদিন করে থেকে ধন্য করেন। যখন যেখানেই থাকেন, আনন্দের বন্যা বয় সেখানে। খরচেরও।

ঠাকুর বলেন, আমার জন্যে কেন এত বাজে খরচ বাপ? তার থেকে টাকাটা হাসপাতালে দান কর না। আমার জন্যে বাড়ি বানিয়ে দিতে চাস? মঠ মন্দির গড়তে চাস? এ দুর্মতি ছেড়ে বাচ্চাদের ইস্কুল খুলে দে না মাণিক? কানা অন্ধ লুলো খোঁড়াদের জন্য আতুর আশ্রম। যে যেমন টাকার লোক, তাকে সেই মতই বলেন। লোকে মোহিত হয়।

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, না, কেবল মাত্র নামগান করা নয়। শুনে একের থেকে অন্যের আত্মোন্নতির সাধনা নয় এঁর। এঁর সাধনা মানবসেবা। মানুষই এঁর কাছে ভগবান। শিষ্যদের জন্যে কোনো নীতি নিয়ম শাসন অনুশাসনের পাট নেই, কৃচ্ছ্রসাধনের বালাই নেই। শুধু বলেন, খা মাখ, আনন্দে থাক; আর এক একজন আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রশ্ন নেই। শাসন অনুশাসনের পাট নেই, এটা কি সংসারী মানুষের পক্ষে কম সুবিধের?

ঠাকুর বলেন, অতশতয় দরকার কী রে বাপু? তোরা যে

ভাড়িখানায় গিয়ে ভাড়ি খাবার প্রেরণা না পেয়ে এখানে আসবার প্রেরণা পাচ্ছিস, সেটাই কি কম কথা না কি? নাম গানটুকু করিস করবি, নচেৎ আমিই তোদের হয়ে করে দেব।

অতএব 'দাস অনন্তানন্দ' যেখানেই থাকুন সন্ধ্যাবেলায় একবার নামগানের আসর বসান। নইলে সারাদিনই ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের সুখ দুঃখের কথা শোনা। আর কোথায় কি জনসেবা-মূলক কাজ হচ্ছে তা তদারকী করা। সাধারণের সঙ্গে আহার-বিহার, সাধারণের মতই বেশবাস। হ্যাঁ, সাধারণের মতই ধুতি পাঞ্জাবি।

গেরুয়ার ছোপে রঙিন নয়।

উনি বলেন। মনই যদি গৈরিক না হয়, তো কাপড়টা গেরুয়ায় ছুপিয়ে কী হবে রে?

তা শিষ্যরা এতে পরম সন্তোষ পায়।

ঠাকুরকে মিহি ধুতি পাঞ্জাবি জরিপাড় উড়ুনি প্রণামী দিতে পাওয়া যায়।

অবশ্য কেউ কেউ রহস্যের হাসি হেসে বলে, বস্ত্র গৈরিক হতে যেন বাকি আছে। তা নয়, ছামবেশেই থাকতে চান। অথচ দেবী নামের ওই মহিলাটি, বাংলার বাইরে দেবীজী, আর বাংলার মধ্যে 'দেবীমা' তিনি কড়া কড়া কথায় বিদীর্ণ করে ফেলতে চান ওই লোককে।

আশ্চর্য! কথার চাষ করতে করতে এত বাড় বাড়িয়ে চলেছেন কি করে তাই ভাবি। শুনলে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় সত্যিই বুঝি কোন মহাপুরুষ বাণী বিলোচ্ছেন।

বলার অসুবিধে নেই। যখন যেখানেই থাকুন দাস অনন্তানন্দ, সাধন ঘরটি তাঁর একান্ত আবশ্যক। আর গুরুবাদী এই দেশে গুরুসেবার প্রতিযোগিতায় কেউ পিছিয়ে পড়ে না। অতএব যখন যেখানেই থাকুন আরাম আয়েসবহুল সাধন ঘরের অভাব হয় না। অতএব বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় সেখানে দেবীজীরও ঠাঁই জোটে।

উনি বলেন, আচ্ছা দেবী! সত্যিই কি আমাকে তোমার খুব পাষণ্ড মনে হয়?

তাতে সন্দেহ আছে আপনার ?

কি জানি। মাঝে মাঝে যেন অবাকই লাগে। কই আমার তো নিজেকে একবারও খুব পাষণ্ড বলে মনে হয় না।

সেটাই তো স্বাভাবিক। মনে হলে তো বোঝা যেত অনুতাপের ছায়া আছে।

কী আশ্চর্য! মাঝে মাঝে খুব অবাকই লাগে। তোমার মধ্যে এত জ্বালা অথচ আমার কেন তার বালাই নেই। না অনুতাপ না আত্মাধিক্কার। দিনগুলো যেন আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায়।

এদেরই বোধহয় 'পাঁড়' বলে।

হা-হা-হা। 'তাই' বলে হয়তো। তবে মনে যদি সর্বদা আহ্লাদ খেলা করে, কী করি বল তো ?

বলার কিছু নেই। পাষণ্ড শব্দটার একটা প্রতীক থাকাও তো দরকার।

উঃ! রাগলে তোমায় এত সুন্দরী লাগে, কী বলব। আচ্ছা তোমার মনে আছে. অনেকদিন আগে আমাদের শরৎবাবুর 'গৃহদাহ' নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। গৌতমও ছিল। আমি বলেছিলাম সুরেশকে গড়ে ফেলে শরৎবাবু, আর হালে পানি না পেয়ে ব্যাটাকে মেরেই ফেললেন। এটা শক্তিমান শিল্পীর উচিত নয়। গোলমেলে পরিস্থিতিতে নায়ক নায়িকা কাউকে মেরে ফেলে প্রবলেম সলভ্ করে ফেলায় আর বাহাদুরী কী ? তাতে তুমি কী বলছিলে বল তো ?

মনে নেই।

বলেছিলে তা' বেশ তো আপনি একখানা পাকা শিল্পী হয়ে লোকটাকে বাঁচিয়ে তুলে কি করতে পারা যায় দেখান না। তা দেখো কী করা যায়। কি করা গেল ?

কী ? কী বলছেন ?

বললাম, সুরেশটাকে দিব্যি বাঁচিয়ে বর্তিয়ে পৃথিবীতে চরে বেড়াতে রাখা যেত।

ওঃ! এর নাম দিব্যি বাঁচা ?

কি করে অস্বীকার করি বল? ব্যাপারটা কি তাই তো বুঝতে পারি না। এই যে গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, এটা-ওটা এগুলোতে তো মানুষের উপকারই হচ্ছে। তাছাড়া আমার এই নামগানের আসরে ভক্তজনের আহ্লাদ।

ওঃ!

দেবীর মুখ কঠিন কঠোর হয়ে ওঠে, এটা কিরকম জানেন? কালো-বাজারীদের মঠ মন্দির গড়ে আত্মসান্ত্বনা লাভের মত।

তাতেই বা কি এল গেল দেবী? সান্ত্বনাটাই তো সার কথা।

আর এই আপনার সাধন ঘরের ছলনা। মনের মধ্যে এতটুকুও কাঁটা ফোটায় না?

অনেকবারই বলেছি দেবী, অনেক ভেবে ভেবেও দেখেছি, কাঁটাটাকে খুঁজে পাই না।

কিন্তু আমায় অহরহ বিঁধছে। আমি এই প্রতারণার দায় থেকে মুক্তি চাই। সেই একদিন, নিমপুর অনন্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের শেষে, রাত বারোটা পর্যন্ত কীর্তনানন্দের সমারোহের পর 'দেবীমা' তাঁর দেবীত্বের আবরণ ছিন্ন করার অবকাশ পেয়ে বলে উঠলেন, উঃ! থামচে প্রণাম করে করে পা দুটোয় বোধহয় ঘা করে দিয়েছে। তার ওপর আবার চরণে গোলাপ দেওয়ার ঘটা। কত যে ছড়ে গেছে। ...আমি আর পারছি না। আমায় এবার মুক্তি দাও। এই ফাঁকির বোঝা বইতে বইতে আমি শেষ হয়ে গেছি।

সেদিন উনি বলেছিলেন, আমি ভাবি কি জানো, এই 'পারছিনাটা' হয়তো তোমার মেয়েলি ঝালাপালার প্রকাশ। কম দায়িত্ব তো পড়ে না, সত্যি! কিন্তু সত্যিই যদি তুমি মুক্তি চাও। আর আমি তোমায় জবরদখল করে রাখব না।

ওঃ! তারপর?

তারপর তোমার অভিরুচি মত জীবন বেছে নেবে। যেখানে যেভাবে থাকতে চাইবে তার ব্যবস্থা করা হবে।

দেবীর মুখ পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, দয়ার

শেষ নেই তোমার। আমি শুধু আমার জন্যেই মুক্তি চেয়েছিলাম, কেমন? একা আমাকে নিয়ে—

দাস অনন্তানন্দ শুয়ে পড়ে বলেছিলেন. কিন্তু দেবী আমার মুক্তির উপায় কোথায়? যে বিশাল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছি, তার থেকে বেরিয়ে পড়ার দরজা কই?

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল সেই স্মরণীয় রাত্রে। যেদিন হাজার দেড়েক লোক নিমপুর আশ্রমে 'মনোরম প্রসাদ' পাওয়ার পর আরামে আয়েসে, উঠোনে, চাতালে, নাটমন্দির হলে, আর বৃহৎ প্যাণ্ডেলের নীচে সুখে ঘুমোচ্ছিল। সেদিন, তাদের দেবীমা ঠাকুরের গায়ে বুকে গুমগুম করে কিল মারতে মারতে বলেছিলেন, কেন? কেন তুমি এতো জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছ? কেন পায়ে পাথরের বোঝা চাপিয়ে চলেছ? কেন বেরোবার পথ রাখোনি? কে বলেছিল তোমায় এত সব করতে? এই কথাই কি ছিল আমাদের?

উনি বললেন, হয়তো ছিল না। কিন্তু সুষমা এখানে এসে দেখলাম এদের এত অভাব অসহায়তা, দুঃখ দুর্দশা—

দেবী তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন, কী বললে! সুষমা? নামটা এখনো মনে আছে?

দেখলে তো আছে।

আর কিছুই মনে নেই অবশ্য।

আর কিছু?

হ্যাঁ, সেটা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সেটা ভুলে যাওয়া দরকার।

দেবীর চোখ মুখ দিয়ে আগুন ছুটছিল, সুষমা কি চেয়েছিল সেটা মনে রাখলে মহাংতার মুকুট পরে রাজা সেজে বসা চলতো না যে। ভুলে গেছ মনে করিয়ে দিচ্ছি—সুষমা স্বামী চেয়েছিল, ছোট্ট একটি সংসার চেয়েছিল। সুষমা সেই সুখ দুঃখে গড়া সংসারটির মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু তুমি? তুমি শুধু সুষমাকে চেয়েছিলে।

ঠিক। ঠিক বলেছ সুষমা, আমি শুধু সুষমাকেই চেয়েছিলাম। তাই তাকে পেয়ে—

এই পাওয়াটাই তোমার পাওয়া বলে মনে হয় তাহলে? এই লুকোচুরি, এই ছদ্মবেশ, এই প্রাপ্য-পাওনাকে চোরের মত পেয়ে ধন্য হওয়া? আমরা এতে ঘেন্না ধরে গেছে। রাত পোহালেই আবার সেই বিরক্তিকর নাটক। সেই এক বিশাল যজ্ঞি, এত রান্না, এত খাওয়া, কতকগুলো প্রতারিত লোকের মুখে জয়গান শোনা—অসহ্য! অসহ্য! ঠিক আছে একাই চলে যাব আমি। তুমি তোমার কর্মযজ্ঞ নিয়ে, আর জালিয়াতি নিয়ে আনন্দে থেকো।

আনন্দে থাকা?

দাস অনন্তানন্দ একটু হাসলেন, ওই আদেশটা বোধহয় পালন করা যাবে না।

তবু কিছুতেই পালিয়ে যাওয়া যাবে না এই মিথ্যের জাল ছিঁড়ে? ঠাকুর সেজে বসে থাকার এত মোহ?

ও তুমি বুঝতে পারবে না দেবী! আমিও জানি না, মোহ না নিরুপায়তা। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কী করে হচ্ছে এসব? কোথা থেকে এসে যাচ্ছে এতো টাকা পয়সা।

অবাক হবার কি আছে?

দেবী বিদীর্ণ গলায় বলেছিলেন, জানি জোচ্চুরির পথে যত সহজে টাকা পয়সা এসে যায় সৎপথে নিশ্চয়ই ততো সহজে নয়। যাক, তুমি যখন আমায় মুক্তিই দিলে তখন কালই চলে যাব।

দেবী!

কী!

একটি অনুরোধ—এই লোকগুলো চলে যাবার আগে যেও না। 'মা মা' করে হেদোবে।

ঠিক আছে।

বলে হাঁপিয়ে বসেছিলেন দেবী।

একটু পরে উনি একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, অথচ আমি ভেবে চলেছিলাম, পাশের গ্রামের খানিকটা অ্যাকোয়ার করতে পারলে, একটা মেয়ে স্কুল বসাবার চেষ্টা করব। দশ মাইলের মধ্যে কোন মেয়ে

স্কুল নেই। স্কুলটা করব, আর তোমার ওপর তার সমগ্র ভার দেব।

ওঃ! এও ভাবা হয়ে গেছে? আমার দায় পড়েছে। নাগপাশ থেকে অক্টোপাশের বন্ধন। মতলব বুঝতে বাকি থাকছে না। কোন দিনই আর যাতে আমি আবার এই—'দেবীমা'র ঘেরাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারি।

কিন্তু চলে যাওয়া কি সম্ভব হয়েছিল 'দেবী'র সেদিন?

তাই যদি হবে, তাহলে ওই ফুলে ঢাকা শায়িত দেহটার পায়ের কাছে বসে···।

এখন তো একটা চড়া গরমের দিন। আর সেই প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবটি ছিল হেমন্ত ঋতুতে জগদ্ধাত্রীর পুজোর দিন।

অনুরোধ ছিল, উৎসবে আগত ভক্তজনের বিদায় নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কিন্তু সেই অপেক্ষান্তেই তো জরুরি টেলিগ্রাম এসে গেল কোথা থেকে যেন, এক পরম ভক্তশিষ্য মৃত্যুশয্যায়, তাকে একবার শেষ দর্শন দিয়ে শেষ আশীর্বাদ দিতে যেতে হবে।

একশো পাঁচ বছরের গুরুদেব তাঁর সুঠাম সুন্দর দেবোপম দীর্ঘ মূর্তিটি এবং পরমা লাবণ্যময়ী লীলাসঙ্গিনীটি নিয়ে মৃতকল্প শিষ্যের শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালেন। শিষ্য শেষ আশীর্বাদ চাইল।

কিন্তু এমনি শোচনীয় ভাগ্য 'ঠাকুরের' যে লোকটা বেঁচে উঠল।

তাহলে?

এরপর আর কে রক্ষা করবে তাঁকে যত সব মৃতকল্প অথবা কঠিন ব্যাধিগ্রস্তদের শিয়রে গিয়ে দাড়ানোর হাত থেকে?

শিষ্য, শিষ্যপরিবার, শিষ্যবর্গের আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুজনেদের মধ্যে ব্যাধি আর মৃত্যু যেন দুহাতে আসতে শুরু করতে থাকল।

তা বলে কোনো শিষ্য যদি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, যদি গৃহপ্রবেশ করে, যদি তীর্থস্থানে দুর্গোৎসব করে, যদি ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়, 'গুরু গুরুমার' উপস্থিতি আর আশীর্বাদের দাবি ছাড়বে তারা? অতএব বর্ষচক্রের সঙ্গে সঙ্গে পাক দিয়ে চলতে হচ্ছে 'যুগল বিগ্রহ'কে। মানুষ দুটোর চেহারাও যে সৃষ্টিকর্তার নিখুঁৎ নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা।

দাস অনন্তানন্দ বলেছিলেন, এটা—মানে চেহারাটাও আমাদের একটা বিপদ দেবী। লোকে 'দেব দেবী' না ভেবে ছাড়বে না।

লোকের কথা বাদ দিন। অন্ধ! অন্ধ! একটা লোক দৈবাৎ মরতে মরতে রয়ে গিয়েছিল বলে, ধরে বসে রইল ঠাকুর মরাকে বাঁচাতে পারেন। তারপর কত জনই মরল, কিন্তু ঠাকুরের সুনামটি অক্ষত অক্ষুণ্ণ। যারা মরল, তাদের দিন ফুরিয়েছিল, নিয়তিতে টেনেছিল। কি বলুন?

আমি কিছুই বলিনা দেবী। ওরা ওদের বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে।

'বসে আছে' বলছেন কেন? ওদের বিশ্বাসের ফাঁদে ফেলে আমাদেরকে খেলাচ্ছে। তা বিশ্বাস জিনিসটা অন্ধই বৈকি না হলে—

আজ এই শোকমথিত জনতার মধ্যে এ গুঞ্জরণ কেন, বিশ্বসুদ্ধ লোকের রোগ ব্যাধির ভার নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়ে আজ ঠাকুরের এই ব্যাধি। আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল আমাদের।...

মহাপুরুষদের তো এই রকমই হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা ভাবুন।

এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিদ্বৎজন। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক বুদ্ধিজীবি ইত্যাদি।

রোদ চড়ে উঠে গড়াতে শুরু করেছে, কলসি কলসি চিনির শরবৎ সাপ্লাই করা হয়ে চলেছে, শেষ কৃত্যের পর এই বিশাল বাহিনী কি খাবে তার চিন্তা চলেছে।

কে করছে এই চিন্তাগুলো?

আপাতত কোনো ওপরওয়ালা নয়। বরাবরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরাই এ দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে। যেখানে অনেক 'মুখ' সেখানেই যজ্ঞি, সেখানেই উৎসবের চেহারা।

কিন্তু অভ্যাগতদের তো কোনো কাজ নেই, হাহাকার বিলাপ আর কথার চাষ চালানো ছাড়া।

অতএব জনৈক পণ্ডিতের উক্তি—

আচ্ছা মহাপুরুষদের তো শুনেছি দেহকে দাহ করা হয় না, সমাধি দিতে হয়।

দ্বিতীয় পণ্ডিতের উত্তর, তার আবার নিয়ম আছে। গেরুয়াধারণ করলে সমাধির ব্যবস্থা। ঠাকুর তো গেরুয়া নেননি। নেবেন কেন? ঠাকুর তো গুপ্ত সাধক ছিলেন। দাহই করতে হবে। এখন সেই হওয়াটার জন্যে তৎপরতা দেখা দিচ্ছে।

নদীতীরে নিয়ে যেতে হবে। ট্রাক এতক্ষণে এসে দাঁড়াল।

এক মহিলা চোখ মুছে বললেন, বাবা থাকলে, কখন ট্রাক লরির ব্যবস্থা হয়ে যেত। কি করে যে কি ঘটিয়ে তুলতেন।

'বাবা থাকলে' ট্রাকটার কি কাজ হতো, সেটা তিনি আক্ষেপের বশে ভাবতে ভুলে গেলেন। আশ্রমের প্রধান পরিচালক এসে আস্তে সাবধানে বলল, মা, দেবীমা। ওঁরা বলছেন, ওঁরা ঠাকুরকে স্নান করিয়ে চন্দন মাখিয়ে সাজিয়ে দেবেন।

দেবী থমকে উঠলেন, ওঁরা? বাবা?

ওই যে বড় বড় ভক্তরা। যারা কলকাতা থেকে গাড়ি করে এসেছেন।

ওঁরা স্নান করিয়ে চন্দন মাখিয়ে দেবেন।

শিউরে উঠলেন দেবীমা।

চোখের সামনে ভেসে উঠল, ফর্সা চামড়ার ওপর ছড়া ছড়া কাল কাল দাগ। সেই নিষ্ঠুর প্রহারের চিহ্ন। সেই চিহ্নটার সঙ্গে চোখে ভেসে উঠল আর একটা দৃশ্য।

একটা রুদ্রমূর্তি দুর্দান্ত মাতাল একটা হান্টার নিয়ে মেরে চলেছে। শালা বদমাস হারামজাদা শূয়োর। বন্ধু। বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসে তার ঘরে সিঁদ কাটছ? রাস্কেল ছোটলোক! বেইমান বিশ্বাসঘাতক! সাহেব বাড়ি নেই, মেম সাহেবের সঙ্গে পেরেম হচ্ছে। তাই মেম-সাহেবের গরম গরম ফ্রাই ভেজে খাওয়ার এত শখ। আটকানো যাচ্ছে না মেরেই চলছে।

যখন রক্ত ফুটে উঠতে দেখল, হঠাৎ হাতের জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, অ্যাঁ তোকে মেরে ফেললাম!

সেই মেমসাহেব তখন বলে উঠেছিল, তোমায় আমি পুলিয়ে দেবো মাতাল হয়ে মানুষ খুন করবে তুমি?

ও ভাসা ভাসা গলায় বলল, বাঃ বেশ! বেইমান বন্ধু আমার বৌকে নিয়ে ভেগে যাবে। আর আমি তাকে কিছু বলব না?

কে বলেছে ও তোমার বৌকে নিয়ে ভেগে যাচ্ছে?

ওইতো ওই বুড়িটা। যে তোমার কাপড় কাচে।

ওই বুড়ির কথায় তুমি একটা মানুষকে খুন করবে? চামার ছোট লোক চরিত্রহীন মাতাল। ও তোমার বৌকে নিয়ে ভাগবে কেন, আমিই চলে যাব। তোমার মত জানোয়ারের সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।

বাঃ। বেড়ে! মাতালের জড়িত গলা উচ্চারণ করল, চলে যাবে? আমার একটা বৌ থাকবে না?

সুষমা নামের সেই মেয়েটার কণ্ঠস্বরে ছুরি ঝলসে উঠল, কী দরকার? ওভারসীয়ার সাহেবের তো কামিন মজুরনী জমাদারণীর অভাব নেই। কিন্তু কোথায় সেই জায়গাটা? মধ্যপ্রদেশের কোন একখানে না?

দেবীমার শান্ত কোমল কণ্ঠ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, থাক বাবা! ও কাজটা আমিই করে দেব। সাধকের শরীর!

ওরা নন্দিত হল।

তাইতো বটেই তো। সাধকের শবদেহ। যে সে ছুঁলেই হল।

কিন্তু মা! আপনি একা পারবেন?

পেরে যাব। যিনি শক্তি দেবার তিনিই দেবেন।

তারপর সেই দুরূহ কর্তব্য সমাপনের পর শুরু হল উদ্দণ্ড নামগান। ওই গান ট্রাকের সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

মা?

না মা সঙ্গে যাবেন না।

মা বলেছেন, এই মূর্তিটিই মনে আঁকা থাক বাবা! অন্য চেহারা দেখতে চাই না। চেহারা? না সেটাই হারিয়ে যাওয়া? উঃ! কি ভয়ানক সেই দেখাটা!

অনেক লোক সঙ্গে গেল, অনেক লোক নিদ্রায় নিথর হয়ে পড়ে রইল। শববাহীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তো থাকতেই হবে। একটু

খানি ভস্মকণা সঙ্গে নিয়ে যাবে না ? এতক্ষণ সকাল থেকে সামনেই নামকীর্তন চলছিল। স্তব্ধতার প্রশ্ন আসেনি। এখন এই পড়ন্ত বেলায় ম্লান আকাশের নিচে আশ্রমে স্তব্ধতা নামল। দেবীমা অবাক হয়ে একটা অপরিচিত দৃশ্য দেখছেন।

এই 'নিমপুর অনন্ত আশ্রমে' আশ্রমদৃশ্য মানেই তো উৎসব দৃশ্য।

লোকে লোকারণ্য, উদয়াস্ত খাওয়া মাখা, নামগান। জগঝম্প।

বাগানের দিকে বিরাট শেড্এর নিচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুন, উনুনের ধারে ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের চকচকে করে সীমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চা! তাতেই ঢালা হতে থাকে ডাল তরকারি খিচুড়ি পায়েস। ভাতটাই শুধু ঝোড়ায় ঝোড়ায়। ফ্যান গালাতে হয় না আপনিই ঝরে যায়। এই ব্যবস্থার মধ্যে ভরাট হয়ে থাকে একটি সাদা উৎফুল্ল মানুষের উপস্থিতি। দেবী একটা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেন। কতকগুলো লোক চারবেলা করে বেদম খাচ্ছে। এই তোমার এত ভাল লাগে ? আমার তো দেখলে গা গুলোয়। এ গলা কার ? সুষমা নামের মেয়েটার না ? যে নাকি স্বপ্ন দেখত, একটি ছোট্ট সংসার। ছিমছাম সুন্দর। যেখানে খাবার থালা মাত্র তিনটি। রান্নাঘরে এতটুকু তোলা উনুন।

কিন্তু সদা উৎফুল্ল মানুষটির এ ধিক্কারে লজ্জা নেই। উত্তর মজুত: লাগে দেবী। খুব ভাল লাগে! এত মানুষ একসঙ্গে পাত পেতে বসে পড়েছে, এ একটা আনন্দ দৃশ্য।

তা' এরা তো আর কাঙালী নয় যে কাঙালী ভোজনের পুণ্যি সঞ্চয় হচ্ছে।

পুণ্যি ? ওরে বাবা! পাপ পুণ্যির হিসেব নিয়ে কে মাথা ঘামায় ? আমার শুধু খুব অবাক লাগে দেবী! ভাবি কোথা থেকে হচ্ছে এসব! কোথা থেকে এসে যাচ্ছে এত টাকা পয়সা। কেউ তো রোজগার করছি না আমরা। অথচ—আচ্ছা তোমার মনে পড়ে দেবী, শুধু দুটো মাত্র মানুষ দিনের পর দিন টের পেয়ে চলেছে অনাহারের জ্বালাটা কী…পেটে ভাত নেই মাথার ওপর ছাত নেই। স্বামীস্ত্রী

পরিচয় গায়ে সেঁটে ঘোরা হচ্ছে তবু লোকের সন্দেহর হাত থেকে রেহাই নেই। তীর্থস্থানে ধর্মশালায় ধর্মশালায় ঘুরেছে নাম পরিচয় বদল করে। কারণ পিছনে পুলিশের হুলিয়া। অথচ দেখো, এই বিশাল আশ্রম গৃহটি, এই সর্বদা দীয়তাং ভুজ্যতাং এর ঘটা, এসব কাদের? তাদের না? অবাক লাগে না তোমার?

অবাক? না অবাক লাগে না। সারাক্ষণ এই জগঝম্পে রাগ আসে, মেজাজ খারাপ হতে থাকে।

আশ্চর্য! যখন থাকার জায়গায় অভাবে তীর্থস্থানে ধর্মশালায় ধর্মশালায় ঘুরেছি দুজনে, তখন তো এই মেয়েটার মেজাজ খারাপ হত না। রাগ আসতো না।

দেবী নির্লিপ্ত চোখ দুটো তুলে বলেছেন, আসতো না?

কই? দেখে বরং অবাক হতে হতো এত সহ্যশক্তি আসছে কোথা থেকে তার?

কি জানি। বোধহয় তখনো মেয়েটার মধ্যে অগাধ আশা মজুত ছিল বলে!

সেই উৎফুল্ল মানুষটা একটু মলিন হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, আমি খুব স্বার্থপর তাই না? কিন্তু আসলে কি আমই এসব করছি? ধাঁধাঁ লাগে।

তারপর?

তারপর আর কথা এগোয়নি, মানুষের ভীড় ঠেলে উঠে এসেছে, ঢুকে পড়েছে সেই ক্ষণিক নির্জনতার মধ্যে। তাইতো আসে। যেখানে শুধু দুজনের বাসনা সেখানে হাজারজন।

মা! দেবীমা, ওবেলা কী কী রান্না হবে একটু বলে দেবেন আসুন। কুটনো কুটুনিরা বঁটি নিয়ে বসে আছে। অতএব রাগে দুঃখে হতাশায় জ্বলতে জ্বলতে গিয়ে নির্দেশ দিতে হয়েছে, দালানের কোণে প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু করে ঢালা গাড়ি গাড়ি আনাজের কতটা কি বাবদ সন্ধ্যায় হবে। এখন এই প্রায়ান্ধকার শেডটার নীচে পড়ে থাকা আগুনহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুনের সারি আর ধোয়া মোছা হয়ে পড়ে

থাকা চৌবাচ্চাগুলোর দিকে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দেবী। এই জড় বস্তুগুলোরও কি মৃত্যু ঘটেছে? এদেরও এমন শবদেহের মত লাগছে কেন?

সরে এলেন সেখান থেকে।

দালানটা ভর্তি শুধু জলের পাত্র। জালা, কলসি, কুঁজো, বালতী। ছোট, বড়, মাঝারি, বৃহৎ। এত জল কেন? ওঃ লোকে শুধু জলই খেয়েছে।

লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি করতে করতেই আলো জ্বলে উঠল। আচ্ছন্ন ভাবটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠল। আস্তে সিঁড়ির সামনে এলেন। কিন্তু একা একা ঘুরছেন বলেই কি কেউ ওঁর দিকে লক্ষ্য করেনি? দু'দশজন অধিক উৎসাহী ব্যতীত, 'স্ত্রী ভক্তরা' তো সকলেই আশ্রমে পড়ে আছেন। তাঁদের মধ্যেই অনেকে চোখে চোখে রাখছেন। আবার নিজেদের মধ্যেও চোখে চোখে কথার আদান প্রদান। ধাক্কাটা সামলাতে পারলে হয়।

ঠাকুরতো ওঁর দেহটাই শুধু ফেলে রেখে দিয়ে গেলেন, প্রাণটুকু তো নিয়েই চলে গেলেন।

আমাদের সব ফুরোল। আচ্ছা ঠাকুরতো ত্রিকালদর্শী, বয়স কত কে জানে। মায়ের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ, তোমার জানা আছে দিদি।

না দিদি! এ রহস্যের কূল-কিনারা কারোরই জানা নেই। জানবার দরকারও নেই দিদি। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলোবে না। আহা এই নিমপুর আশ্রম কি আর তেমন ভাবে থাকবে?

কি আনন্দেই এসেছি গিয়েছি। যেন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসেছি। দেখতো দিদি মা একা একা আবার কোন দিকে গেলেন। যেরকম অবস্থা দেখছি টলে না পড়ে যান।

ওনারা না ফিরলে তো আর মাকে একটু জল খাওয়ানোও যাবে না? অন্ততঃ একটু লেবুর শরবৎ।

কে বলতে যাবে ভাই। কার এত সাহস হবে।

তা সত্যি। কে বলতে যাবে। কার এত সাহস হবে।

অথচ ঠিক এই মুহূর্তে তিনি ভাবছিলেন, কেউ একটু শরবৎ নিয়ে তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে আসতো যদি!

ও দিদি মা কোথায় গেলেন বলুন তো?

মনে হচ্ছে ওদের ঘরে উঠে গেলেন। বাবার সাধন কক্ষে। সিঁড়ির দুয়োর বন্ধ করলেন না তো? বড় ভয় করছে ভাই।

রাত্রে ওঁরা যখন সাধন ঘরে উঠে যান, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দেন। অর্থাৎ দিতেন। গতরাত থেকেই শুধু ওঁরা নীচের তলায়। যাঁরা ভয়ের বিনাশ করতে ভালবাসেন তাঁদের মধ্যেই একজন নিঃশব্দে উঠে গিয়ে সিঁড়ির হাফ্‌ পর্যন্ত দেখে এসে ঈষৎ স্বস্তির-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নাঃ খোলাই আছে।

না ভয়ের কিছু নেই, জ্ঞানী মানুষ। যা হোক কিছুতো আর করে বসবেন না অজ্ঞানী সংসারীদের মতন!

যেন অজ্ঞানী সংসারী 'মানুষ'রা তাদের জীবনলীলার সঙ্গীটি হারিয়ে ফেললেই 'যা হোক' একটা কিছু করে বসেন।

দোতলায় উঠে এসে দেবীমা সিঁড়ির কোলপসিবলের সামনের চৌকো চাতালটুকু পার হয়ে প্রথমেই সেই শাটিনের বিছানা সম্বলিত পালঙ্কপাতা ঘরটায় এসে দাঁড়ালেন। গতরাতে আর এসব ব্যবহার হয়নি। যেমন সাজানো থাকে, তেমনিই অটুট রয়েছে। ভক্তদের 'প্রাণের প্রণামী'র দৌলতে কক্ষসজ্জায় কোনো আধুনিক বিলাস দ্রব্যের ত্রুটি নেই। বেড সুইচ আছে, টেবল ল্যাম্প আছে, জানালায় জানালায় মূল্যবান পর্দা। খাটের ধারে ছোট্ট শ্বেত পাথরের টেবিল। দেয়াল ধারে একটি আয়না। স্তব্ধ হয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ।

হঠাৎ মনে হল, সুষমা কি রকম ঘর চেয়েছিল? তার চাওয়ার সঙ্গে কি এর কোনখানেও মিল নেই? অথচ, সুষমা অহরহ অসন্তোষে ঝলসেছে।

আস্তে চলে এলেন এ পাশের ছোট্ট ঘরে।

যেটা নাকি দেবীমার জন্যে উৎসর্গীকৃত।

অবদান অনাড়ম্বর এই ঘরটার ওদিকের সামনের দরজাটা খুললেই বিশাল ছাদ। আশ্রম গৃহের আয়তন তো কম নয়। কতটুকুই বা দখল করেছে ওই সাধন ঘর আর এই মায়ের ঘরটুকু ?

এখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। সামনের ছাতটার ওপিঠে আশ্রমের বাগান। তার ঘনছায়া যেন এই ছাদটাকে প্রহরীর মত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা থেকে ফিরে ঘরের আলোটা জ্বাললেন। দেয়ালধারের ছোট মাপের বইয়ের আলমারীটার কাছে চলে এলেন। আশ্চর্য, এ আলমারীতে 'আশ্রম সংসদ' থেকে প্রকাশিত দাস অনন্তানন্দের কোনো 'বাণী পুস্তক' নেই। নিতান্তই কিছু জাগতিক পুস্তক আর সমগ্র, রবীন্দ্র রচনাবলী। ঠাকুর তাঁর ভক্তশিষ্যদের কাছে যেন আদেশ দিয়েছিলেন, ওরে তোদের দেবীমার জন্যে এই বই একসেট আনিয়ে দিসতো।

তারপর একটু হেসে বলেছিলেন, আমার আস্তানা তো তোদের সকলের ঘরে ঘরে। কিন্তু তোদের মার নিজস্ব আস্তানা এই নিমপুর বুঝলি ?

ভক্তদের তো আর "আদেশ করা" ছাড় আর কিছু করতে হয় না। আদেশমাত্রই এসে যায়। তাই গিয়েছিল।

কিন্তু কদিন বা এখানে থাকা ? কখনই বা পড়া ?

তাঁতির মাকুর মত অবিরতই তো চলেছে টানা-পোড়ানোর টানা টানি।

জগতে সবথেকে দুঃখী লোক বোধকরি তারাই—বলেছিলেন একদিন 'দেবী', যাদের ভক্তের সংখ্যা অসংখ্য।

উনি সেই গলা নামিয়ে 'হা হা' করে হাসির পদ্ধতিতে হেসে উঠেছিলেন আমার ওই অভাগা ভক্তগুলো যেন তোমার প্রতিপক্ষ।

দুটোই সত্যি। অভাগা না হলে 'দাস অনন্তানন্দের' শিষ্য হতে আসে না। আর প্রতিপক্ষ তো বটেই। ওরা যদি আপনার জীবনে এসে হাজির না হতো—

দেবীমার নামের সরু চৌকীর বিছানাটা, যেটা কোনোদিনই দেবীমার ব্যবহারে লাগেনি, সেইটার ওপর এসে বসলেন দেবীমা।

নিঃসীম অন্ধকরে হওয়া বৃহৎ ছাদটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলেন, এবার ছুটি। এবার এই দেবীত্বের খোলশ থেকে মুক্তি। এতদিনের মিথ্যার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসা। ওই অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন লোকগুলোর কাছে সত্যের স্বীকারোক্তি করে বিদায় গ্রহণ। সেই আমার খাতাখানা দেখিয়ে যাব ওদের।

প্রায় অশরীরী ছায়ার মত দরজায় এসে দাঁড়াল মালতী।

এই নিমপুর আশ্রমের পরিচালন ভারপ্রাপ্তা সর্বাধিনায়িকা।

মা!

অস্ফুটে বলল, ওঁরা ফিরেছেন।

আমাকে কি নামতেই হবে মালতী?

মালতী এ উত্তর আশা করেনি তবু শিউরে উঠে বলল, না না। আপনাকে কষ্ট করে কিছু করার দরকার নেই, শুধু বলেছিলাম কি, একটু যদি শরবৎ খেতেন।

শরবৎ।

দেবীমার মনে হোল, কখন থেকে যেন এই শব্দটাকে ভিতরে লালন করছিলেন।

খুব শান্তভাবে বললেন, আচ্ছা দাও।

কিন্তু এইটুকুতেই কি ছাড়ান পাওয়া সম্ভব?

শরবতের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন ব্যারিস্টার মল্লিক।

ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

ঠাকুর আদর করে ডাকতেন 'বার অ্যাট্ ল' বলে।

দেবী উঠে দাঁড়ালেন। সরে এলেন।

'বার অ্যাট ল' তাঁর দামী স্যুট পরা দীর্ঘ শরীরটাকে উপড় করে ফেলে হাত দুটো মাথার সামনের দিকে প্রসারিত করে বললেন, মা! আমরা অনাথ হয়ে গেলাম। আমরা সব হারালাম।

আচ্ছা এই তো উপযুক্ত সময়।

এই সময়ই তো বলে ফেলা যায়, দেখো বাপু তোমাদের কিছুই হারায়নি। কারণ তোমাদের কিছুই ছিল না।

কিন্তু বলে উঠতে পারলেন না। লোকগুলো সারাদিন অভুক্ত। অবশ্যই বিশ্রামের জন্যেও লালায়িত। আজ থাক। সকালে যখন সবাই যে যার বাড়িতে চলে যাবে, তখন। হ্যাঁ তখনই বলবেন। আস্তে সাবধান।

ব্যারিস্টার আবার বলে উঠলেন, না!

বল বাবা! অভ্যস্ত বাক্‌ভঙ্গীটা আজ পর্যন্ত থাক। ব্যারিস্টার বললেন, ঠাকুর আমাদের জন্যে কিছু বিদায় আশীর্বাদ টেপ করে রেখে গেছেন?

বিদায় আশীর্বাদ।

টেপ!

স্মৃতি আর চৈতন্যের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল। এই ধরনের কী একটা কথা কবে যেন শুনেছিলেন না তিনি।

হেসে হেসে বলা কথা, উঃ! ব্যাটাদের জন্যে রোজ একখানা করে 'ফ্রেশ আশীর্বচন বানাতে বানাতে জীবন মহানিশা হয়ে গেল। বুঝলে দেবী একখানা পুরোক্যাসেট ভরে ব্যাটাদের জন্যে 'বাণী' বিতরণ করে রেখে যাব, আমার মরণের পর আসর ডেকে শুনিয়ে দিও। বলেও রেখেছি ব্যাটাদের।

বোধহয় সেইদিনই দেবীর অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ঝলসে ছিল। আহা মরণের পর বলতে আছে? বলুন দেহ রক্ষার পর। সাধুসন্তরা তো মরেন না, দেহরক্ষা কারন। তা আপনি দেহরক্ষা করবেন আর আমি আপনার অমৃত বাণী বিলোবার জন্যে এখানে পড়ে থাকব?

আরে রেগে যাচ্ছ কেন? কথার কথা মাত্র। তাহলেও বলেই রাখছি, আমার এই আলমারীর লকারে'র মধ্যে একটা ছোট বাক্স পাবে চাবিবন্ধ। তার মধ্যে—

দেবী হাতজোড় করে বলেছিলেন, দোহাই প্রভু, আপনার চাবিবন্ধ বাক্স আপনারই থাকবে, আমার তার খবর শোনার দরকার নেই। কেন,

এক্ষুনি দেহরক্ষার চিন্তা কেন? একশো পাঁচ বছর যখন এমন খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে কাটিয়ে এলেন, তখন আরও একশো পাঁচ কাটাতে পারবেন না?

আচ্ছা দেবী 'একশো পাঁচটা' আমি রটিয়েছি?

—যেই রটাক, রটেছে তো? তার খেশারৎ দিতে হবে না?

সেই কথাটা মনে পড়ে গেল ওই আলোড়নের মধ্যে।

'আলমারী লকার' চাবিবন্ধ 'ছোট বাক্স' সব কটা শব্দই চেতনার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

আস্তে সাবধানে বললেন, দেখব। খুঁজে দেখব।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ব্যারিস্টার সাহেব ব্যাকুলতায় দৃঢ়তায় বলে উঠলেন, ঠাকুর যখন বলে গেছেন, তোদের জন্য 'শেষ বাণী' রেখে যাব টেপ এ ভরে তখন নিশ্চয়ই আছে। দেখবেন মা! কালকের সকালের 'স্মরণ সভায়' প্রকাশ করবেন সেটি, আশপাশের গ্রাম থেকেও লোক আসবে মনে হয়। নদীতীরে জানলো তো অনেকে দুঃসংবাদটা।

হ্যাঁ দাস অনন্তানন্দের অমৃতবাণীগুলি টেপ করে তুলে রাখার জন্যে টেপ রেকর্ডার আছে বৈকি। বেশ উচ্চমানেরই আছে। একজন ভক্ত শিষ্যের মেয়ে জামাই আমেরিকায় থাকে, সে সেখান থেকে অনেক উপ-হার দিয়েছিল। সঙ্গে ডজন কয়েক ক্যাসেট। ঠাকুরের ভক্ত মানেই সপরিবার ভক্ত। মায় জামাইগুলো পর্যন্ত। তাছাড়া এমনিতেই তো যখন যেখানে যান উনি, মানে যেতেন, গিয়েছেন তখনি তো ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডারের ছড়াছড়ি ঘটেছে। বড় বড় ভক্তদের বাড়িতে, আজ কালকার বাড়িতে আর এসব জিনিস না থাকে? এ কী আর বেচারী 'শ্রীম'র আমল? যে, ওই পাঁচ খণ্ড 'কথামৃত' লহরী দোয়াতে কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখে মরবেন। ঠাকুরের সব কথাই ধরা আছে টেপে এবং অতঃপর পুস্তিকায়। আর এই তাঁর প্রিয় নিমপুরে এলে প্রতিদিনকার সকালের ভেট। সবার জন্যে তিনি আগের রাত্রে একটি করে 'বাণী' রচনা করে টেপ-এ ধরে রাখতেন, সকালে সেইটি শোনাতে

হতো দেয়ালে দেয়ালে মাইক্রোফোন দিয়ে। যাতে বাইরেও মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। শক্তপোক্ত ছোট একটা স্টীলট্রাঙ্কই আছে, ওই মূল্যবান 'বাণী'তে ভরা ক্যাসেটগুলি সুরক্ষিত রাখতে।

রোজ এতখানিটা ধর্মকথা বানাতেও পারেন বটে !

'দেবীমা'র এই বিরক্ত উক্তিতে দাস অনন্তানন্দ বিব্রত হাসি হেসে বলতেন, কী করব বল ? হতভাগারা যে নাছোড়, আমায় যেন মহাত্মা গান্ধী পেয়েছে। প্রতিদিন প্রার্থনা সভার জন্যে নতুন বাণী ?

দেবীর ব্যঙ্গ মন্তব্য, গান্ধী না হলেও মহাত্মা তো বটে।

আচ্ছা কবে থেকে যেন ওই ফ্রেশ টেপ-এর ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেল ?

আসানসোলের সেই 'পরমার্থসভা'র বক্তৃতার দিনের পর থেকেই না ? ওখানেই ভাষণ দিতে দিতে হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করলেন ?

মুহূর্তেই সভাভঙ্গ মুহূর্তেই ডাক্তারের পসরা। ঘোষণা হার্ট অ্যাটাক্।

একটু সুস্থ হয়েই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন উনি, 'নিমপুর আশ্রমে' নিয়ে চল্ আমায়। শেষের দিনকটা ওখানেই—

আঃ ছিঃ ছিঃ, একী নির্মম কথা ?

বলুন কিছুদিন একটু রেষ্ট নেবেন।

আচ্ছারে বাবা ! তাই তাই।

তবে বিশ্রামই যখন রোজ আর নতুন বাণীতে কাজ নেই। সকালে একটা করে পুরনো টেপই চালানো হোক। তারপর নামগান তো আছেই, সে তো ঠাকুর মাত্র একটি লাইন বলেই থামবেন। তাই তাই। কিছু সংখ্যক ভক্তজন নিয়ে হার্ট অ্যাটাকের পর ঠাকুরের এই বিশ্রাম বাস।

কিন্তু ক'দিনের জন্যেই বা ? কদিন আর শান্ত, শান্তি ? তার মধ্যেও তো কাগজ পত্র, খসড়া, প্ল্যান কত কী ?

দেখ দেবী, কত কাজ, কত পরিকল্পনা, বাঁচবার আমার কত সাধ, আর মুখ্যুরা নাকি বলে বেড়াচ্ছে, 'বাবার এটা ইচ্ছা মৃত্যু।'

দেবী শান্ত কঠিন গলায় বলেছিলেন, আমিও তাই বলি।

তুমিও তাই বল ?

হ্যাঁ প্রদীপের সলতেটা অনবরতই উস্কে উস্কে আলো বাড়িয়ে চললে তেলটা তাড়াতাড়িই ফুরোয়।

তা বটে। আলোটা বড্ড বাড়ানো হয়ে গেছে তাই না? কিন্তু কী করি এতো পোকা! সবাই পাখা পোড়াতে ছুটে আসে।

শরবতের গেলাসটা খালি হলে, সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সাধন ঘরে চলে এলেন দেবী।

'দেবী' না সুষমা?

যে মেয়েটা এখন এই ঘরটার প্রতিটি দেওয়াল থেকে একটা ধিক্কার অভিযোগ, আর বিদ্রোহের বাণী শুনতে পাচ্ছে।

রাতের পর রাত যত কথা শুনেছে ওই দেওয়ালরা সবই কি টেপ করার মত ভরে রেখেছে তাদের বাড়ির আস্তরণের মধ্যে?

আর তখনই কে যেন বলে উঠেছে, আচ্ছা সুষমা, তোমার ওই তীব্রতা কি শুধুই ছদ্মবেশের বিরুদ্ধে? মিথ্যার বিরুদ্ধে, না তোমার ব্যর্থ স্বপ্নের আশাভঙ্গের জ্বালায়? ভাব তো ভাল করে? ছদ্মবেশ তো তোমার সেই কবে থেকেই? সেই যে যেদিন মধ্যপ্রদেশের কোন এক শহরের এক মাতাল ওভারসিয়ারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে? সেদিন থেকেই কি তোমার ছদ্মবেশ নয়?

স্বামীস্ত্রী পরিচয় যার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছ তুমি, সে কী তোমার বিবাহিত স্বামী?

তোমার 'সুষমা' নাম পরিত্যাগ করে কতবারই তো তুমি নাম পালটে পালটে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত পালিয়ে বেড়িয়েছ। তখন তো তুমি এমন ধিক্কারে তীব্র হয়ে ওঠোনি।

তার কারণ তখনো তোমার মধ্যে বেঁচে রয়েছে সেই ছোট স্বপ্ন, ছোট আশা। কোনো একখানে 'ধন নয় মান নয়, এতটুকু বাসা।' কিন্তু সেটুকু আর জুটল কই?

তোমাদের পিছনে খুনের অভিযোগ তাড়া করে ফিরছে। অথচ কে জানে ওই তাড়াটা আদৌ পুলিশের কিনা। নিজেরই মধ্যে কিনা। ওভারসিয়ারের চাবুক খাওয়া বন্ধু কি তাকে তারই বন্ধুকে গুলি

করেছিল ? না কি—ব্যাপারটা বিপরীত হতে গিয়ে একটা এ্যাকসি-ডেণ্ট মাত্র। কে জানে। কে জানতে গিয়েছে ?...কতদিন যেন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওই তাড়া খাওয়া প্রাণীদুটো এক আলো-কোজ্জ্বল মঞ্চে ঝলসে উঠেছে। 'সুষমা' নামের মেয়েটা দেবীমা হয়ে গেছে। আর তার পর থেকেই দেবীমার খোলসের মধ্য থেকে 'সুষমার' অভিব্যক্তির তীব্রতা অভিযোগের তীক্ষ্ণতা। যেগুলো আছড়ে আছড়ে পড়েছে 'অনন্তানন্দ' নামের নতুন এক ভাবমূর্তির ওপর। লোহার আলমারীর চাবি খুলতে খুলতে সুষমা ভাবল, পুরুষ জাতটা যত সহজে সব অবস্থার সঙ্গে আপোষ করে নিতে পারে, মেয়েরা তা পারে না।

মেয়েরা আছড়ায়, মেয়েরা ছোবল হানে।

সুষমা জেনেছিল মাতাল চরিত্রহীন ওভারসিয়ারটা তাকে 'স্বামী' দেয় নি। সন্তানও দিতে পারবে না। তাই তাকে ছোবল হেনে চলে এসে-ছিল। কিন্তু তার স্বামীর বন্ধু ? যে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল।

সে তাকে 'বর' যদিবা দিতে চেয়েছে, 'ঘর' দিতে পারেনি। অতএব তার ওই দিতে চাওয়াটা অর্থহীন হয়ে গেছে।

আর সন্তান ? দুরন্ত জ্বালা তো সেইখানেই।

পালিয়ে বেড়ানো দুটো প্রাণীর মধ্যে থেকেও সুষমা নামের প্রাণীটা 'মা' হবার সম্ভাবনায় আহ্লাদে আবেশে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধু অসুবিধেয় পড়ার অজুহাতে সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে গিয়ে চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেল সুষমার 'মা' হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেশ।

ডাক্তারের অসাবধানতা ? মানবো না একথা। ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে তুমি—

সুষমা সেই দ্বিতীয় প্রাণীটাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলেছে, ইচ্ছে করে ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে—তোমার অসুবিধেটাই বড় হয় ? তাঁর বুকের ওপর কিল মেরেছিল গুম গুম করে।

আচ্ছা সুষমা নামের মেয়েটা কি অন্ধ ছিল ? বুঝতে পারেনি লোকটার মধ্যে কত ভালবাসা ছিল, কত মমতা, কত ক্ষমা। ইচ্ছা করলেই তো এরকম ক্ষেত্রে সে অসুবিধের ভয়ে তার বন্ধুর বৌকে যেখানে

হোক ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারতো। লোকে তাই যায়। সে তাকে অবিরত বয়ে বয়ে বেড়িয়েছে, কুকুরের মত তাড়া খেয়ে অন্য আস্তানা খুঁজতে বেরিয়েছে।

তাড়া খাবে না?

বাসা ভাড়া না দিয়ে বাস করতে থাকলে কে তাঁকে মাথায় করে নাচবে? সঙ্গতি নেই তো ঘরভাড়া করছিলি কেন? তাছাড়া আচার আচরণেই বা সঙ্গতি কোথায়?

একটা লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে ঢুকেছে, ঘর করতে। তা কোন কাজকর্ম করে না কেন? দেখতে সুকান্তি সুপুরুষ, ভালঘরের ছেলে বলেই মনে হয়, কিন্তু কাজকর্ম করে না কেন? জুজুর ভয়ে লুকিয়ে বসে থাকার মত মুখে গুঁজে বসে থাক কেন?

শালা নির্ঘাৎ পরের পরিবার ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। দে শালাকে পুলিশে দে।

কে বলেছে?

বেনারসের সেই চমৎকার ধর্মশালার ম্যানেজারটা না?

কী অপূর্ব জায়গা, গঙ্গার ওপর ঘর।

শালা, আজ পাঁচদিন ঘরের মধ্যে ঘুষে বসে আছে, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে বলেইনি। বিশ্বনাথ দেখছে না, গঙ্গাস্নান করছে না, বাইরে থেকে খাবার এনে এনে মেয়েছেলেটাকে খাওয়াচ্ছে। এ শালা ভাল আদমী হবে? ভাগো ভাগো। এখানে জায়গা হবে না।

অতএব আবার পলায়ন!

আবার আশ্রয়ের অন্বেষণ!

আচ্ছা—

সুষমার 'দেবীমা' হয়ে ওঠার ইতিহাসটা কী লিখেছেন দেবীমা তাঁর খাতাটায়? যে খাতায় 'মুখোস খুলে দেবার' তীব্র আয়োজন?

ঢং ঢং করে আশ্রমের পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল।

কাল ঠিক এই সময় থেকে অক্সিজেন দেওয়া শুরু হয়েছিল।

আলমারীর লকারটা খুললেন দেবীমা; খুললেন সেই সেই ছোট্ট

বাক্সটা। প্রার্থিত জিনিসটা সহজেই পেয়ে গেলেন। কাল সকালে স্মরণ সভায় দাখিল করতে হবে এটি।

পুরো একটা ক্যাসেট ভর্তি করে কতখানি উপদেশবাণী ভরে রেখে গেছেন ওদের গুরু? দেবী প্রায় একটু হাসলেনই। মনে পড়ল ঠাট্টার হাসি হেসে হেসে একদা বলছেন তিনি, প্রতিদিনই তো সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়! তবু ভক্তরা আহ্লাদে রোজই বিভোর। ঠাকুর কী মধুর কথাই শোনালেন আজ। মহিলাদের তো আবার বেশী বেশী। গদগদ বিগলিত।

আর একটা হাসির সঙ্গে উত্তর—হিংসে হয় না কি?

গলায় দড়ি। তবে আর নতুন কথাটা কী?

আহা! হে বাবা সকল এই মানব জন্মের তুল্য জন্ম নেই। অতএব হে মানবপুত্রগণ, মানবোচিত কর্ম করে যাও।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ছেলেবেলায় স্কুলে পড়তে হওয়া সেই মথি লিখিত সুসমাচারের একটু সমাচার শুনলাম।

ওই রকম ভাষা আমার?

ভাষা না হোক ভাব তো বটে। বলে বলে গলা ফাটিয়ে ফেললেও মানবপুত্রগণ মানবজনোচিত কাজ করবে না।

না করুক শোনেও তো? সেইটুকুই লাভ। সেটাই মজা।

অর্থাৎ আপনি চালাকির দ্বারা মহৎ কর্ম করে চলেছেন, কেমন?

কী যে করে চলেছি, দেবী, নিজেই ভুলে গেছি। অবস্থাটা সেই তালবেতালের ভূতের মত। একটা খুঁটি চেপে ধরে উঠছি আর নামছি। নামছি আর উঠছি। কেন উঠছি কেন নামছি জানি না।

আহা এই আশীর্বচনের, আর বাণী বিতরণের বালাইটা যদি না থাকতো। বেশ সুখে থাকা যেত। বলেছিলেন এই কথা উনি। আজ ভোরে তিনি দেহরক্ষা করেছেন, এবং কিছুক্ষণ আগে যাঁর শেষকৃত্য সমাপন করে ফিরেছে ওরা। ক্যাসেটটা বার করে রেখে পাশের সেই ছোট্ট ঘরটাতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন দেবীমা।

মালতী একবার ছোট্ট করে বলেছিল মা, আজকের রাতটা আমরা কেউ চারতলাটায় পড়ে থাকি।

দেবীমা প্রায় হেসে উঠেই বলেছিলেন, কেন রে? মার ভয় করবে? না না কোনো দরকার নেই।

কিন্তু একটু পরেই কেমন অস্বস্তি ভাবে উঠে পড়লেন। ভয়ে নাকি? তা ভয়েই। হঠাৎ মনে হল ঠিক জিনিসটাই বার করলাম তো? বলেছিলেন বটে টেপ করে রাখব। রেখে উঠতে পেরেছিলেন কী? জিগ্যেস করে জানবার উপায় নেই। হঠাৎ ভারী অদ্ভুত লাগল দেবীর। কিছু জিগ্যেস করার দরকার হলে, আর কোনো উপায় নেই। অথচ গত রাত্রে জিগ্যেস করেছিলেন কিন্তু।

কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মাথা খুঁড়লেও আর—কিন্তু আগামী সকালে যদি সভার মধ্যে টেপটা চালাতে গিয়ে কিছু এদিক ওদিক হয়। যদি দেখা যায় কিছু বলে যাননি। একটু পরীক্ষা করে রাখা ভাল।

উঠলেন। বুক সেলফের মাথা থেকে টেপ রেকর্ডারটাকে পাড়লেন। ক্যাসেটটা লাগিয়ে স্বরটাকে খুব খাদে নামিয়ে দিয়ে চালিয়ে দিলেন।

আর সহসা চমকে উঠলেন। শিউরে উঠলেন।

এমন হা হা করে হাসল কে?

সেই গলা। সেই দিলখোলা ভঙ্গী।

বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। তারপর স্থির হলেন। ক্যাসেটটার মধ্যে থেকেই হাসিটা বেরিয়ে এসেছে। এটাই প্রথম পর্ব। কিন্তু কেন? এমন অদ্ভুত ভঙ্গী কেন? কী এটা?

প্রথমেই 'ওঁ নমো নারায়ণায়' না বলে হঠাৎ এমন হা হা হাসি দিয়ে আরম্ভ কেন?

কিন্তু ভাবনাটার জন্যে যন্ত্রটা তো থেমে নেই। সে বলে চলেছে—

হা হা হা! হা হা হা! কী রে? প্রভুর মরণোত্তর ভাষণ শুনবি বলে বসে আছিস? আহা রুমাল বাগিয়ে বসে আছিস বোধ হয়। ক্ষণে ক্ষণে চোখ মুছবি বলে।

তা শোন তোদের গুরুব্যাটার শেষ মহৎবাণী। তবে আহা মুখ্যু বটে তোরা—

স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন দেবী। এ কী? একার কথা? কণ্ঠস্বরে

তো কোন সংশয় নেই। তবে ? সদ্য মৃতের আত্মা কি ওই যন্ত্রটার ওপর ভর করে উপদ্রব শুরু করতে চাইছে ?

হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন। ভয় পেয়েই। দারুণ ভয়। কিন্তু একটু পরেই খুললেন আবার খুব কমিয়ে।

হাঁ রামমুখ্যু। একদম গবেট। নইলে এই একটা ঠগ জোচ্চোর জালিয়াত মিথ্যাবাদীকে গুরুদেব বলে পায়ে পড়িস ? 'মহাপুরুষ' বলিস হা হা হা। কস্মিন কালেও এই শালা অজিত মহাটহা কিছু নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই শালা অনন্তানন্দের আসল নাম হচ্ছে অজিত। অজিত ঘোষাল। একদম অডিনারি একটা নাম। হাজারে হাজারে মেলে। তেমনি অডিনারি বাড়ির ছেলে। জন্মেছিল বর্ধমানের একটা গণ্ডগ্রামে। জন্মেই মা খেয়ে বসেছিল। আরে আরে হা হা হা। একশো পাঁচ বছরের ওপারের ক্যালেণ্ডার হাতড়াতে যাসনি। ওঃ, কোন্ উল্লুক যে এই রটনাটি রটিয়েছিল। একশো পাঁচ। হুঁঃ। এই অজিত রাস্কেলের বয়েস হচ্ছে এখন আপাতত এই উনিশো বিরাশী সালে তেপান্ন।

জন্মতিথি ? মাঘীপূর্ণিমা ? ঘটাকরে উৎসব হয় যেদিন ? ঘোড়ার ডিম। কাঁচকলা ! ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে শুনেছি, পচা ভদ্দরে জন্মেছিলি তুই। কঁ্যাথা শুকোতে আমার প্রাণ গেছে।

তারিখ ?

অত আদরের কাজ নেই। জন্মকালে মা মরেছে। দু মাস বাদ বাপ আবার বিয়ে করেছে, তার আবার জন্মকালের তিথি তারিখ ঠিকুজি কুষ্ঠি ! বাপ ব্যাটা কচি ছেলের ছুঁতো করে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করল। কিন্তু ছেলে মানুষ হতে থাকল বুড়ি ঠাকুমার কাছে। বুঝলি তো মজা ? সংসারের রহস্যই এই। অকর্মেরা সাপোর্টের জন্য একটা ছুঁতো খোঁজে। যেমন ওই শালা অজিত ঘোষাল যে একদিন বাপের বাক্সর টাকা হাতিয়ে আর ঠাকুমার কাছে গচ্ছিত থাকা মরা মায়ের গহনাগুলো হাতিয়ে না বলে কয়ে বাড়ি থেকে কেটে পড়ল। সেও একটা ছুঁতো খাড়া করেছিল বৈকি। কলকাতায় গিয়ে কলকাতার ভাল কলেজে পড়বে।

ঠাকুমা বলেছিল, তাই ভাল। তোর মায়ের জিনিস তুই নে যা। নইলে আমি মরলেই তোর ওই নক্কীছাড়া বাপটা গয়নাগুলো সোহাগের দোজ্ পক্ষের হাতে তুলে দেব।

হা হা হা। অতএব বিবেক পরিষ্কার। অতঃপর শ্রীমান অজিত কলকাতায় এসে হোস্টেলের সীট না পেয়ে মেছোবাজার স্ট্রীটের একটি মেসে এসে একপাল দামড়া বুড়োর সঙ্গে বসবাস শুরু করলেন। লোক-গুলোর পেশা হচ্ছে কেরাণীগিরি, আর নেশা হচ্ছে হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি যাওয়া। ব্যাস। আহা পড়াশুনোর পক্ষে কী পরিবেশ। বর্ধমান কলেজের থেকে কতই ভাল পড়া হতে থাকছে এই কলকাতার কলেজে।

অবিরত বুড়োধাড়িদের সঙ্গে থাকা। যারা না কি মাছের টুকরোর সাইজ নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কাটাকাটি কাণ্ড করে, চানের ঘরে ভুলে তেলের শিশিটা ফেলে এলে পরে বারবার নেড়েচেড়ে দেখে তেলটা কমে গেছে কিনা। প্রাণ হাপিয়ে উঠছিল। তাদের সঙ্গে বাস। অজিত শালা অন্য বাসা খুঁজতে লেগেছে এই সময় তারাপদ বলে একটা ছেলে ওই মেসে এসে উঠল। পড়ুয়া ছেলে। ব্যাস দুদিনেই প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠল তারাপদ! আর হয়ে গেল শালা অজিতের।

টের পেল না ওই তারাপদটা তার জীবনের শনি। এসে মেসের ঘরে রুমমেট হয়ে এসে জুটল অজিতটাকে খতম করতে। কী-রে কী ভাবছিস? গুরু ব্যাটা এখন এই মরণোত্তর ভাষণে এমন একটা গল্প ফাঁদতে বসল কেন। বসলাম তোদের মহান গুরুদেবের স্বরূপ বোঝাতে। বুঝলি?

আহা তোদের জন্য আমার মাঝে মাঝে বড় দুঃখু হতো রে। তোরা কত অনেষ্ট! কত বিশ্বাসী!

কিন্তু কী করবো বল! তোদের মাথার ওপর আচমকা একটা হাতুড়ি বসিয়ে দিতে পারাও তো শক্ত বাপ! তা সেই বাবু অজিত ঘোষাল যে বন্ধুরত্নটি লাভ করলেন তাঁর মধ্যে অনেক গুণ বিদ্যমান। সব সময় মুখ ভার করে বলতো, তুই ভাই ভাল ছেলে। তোর কথাই আলাদা। তবে অজিত কুমারের যে খারাপ ছেলে হবার জন্যে ওই

তারাপদর সঙ্গী হওয়া হতো না, তার একমাত্রই কারণ পয়সার অভাব। কলসির জলের ব্যাপার তো। অবিশ্যি মিথ্যে বলব না। বি, এ, পরীক্ষা দিচ্ছে জেনে, সেই নক্কীগাড়া বাপটি দিয়েছিল কিছু টাকা পয়সা। তার পরেও দিয়েছে এম, এ, পড়া পর্যন্ত। তখন বোধহয় ভাবছে ছেলেটা দামী হয়ে উঠছে। বিয়ের বাজারে দর উঠবে। কাজেই হাতে রাখা ভাল। আহা বেচারী শশী ঘোষাল!

ছেলেটা যে ইতিমধ্যে হাতছাড়া হয়ে বসে আছে তা তো আর জানত না।

কী রে? তোরা ভাবছিস তো ব্যাটা অজিত বোধ হয় ওই তারাপদটার পাল্লায় পড়ে বসে গেছে। তা নয় রে বাপ! তা নয়। তাহলেও তো বরং ভাল ছিল তাতে তোদের কপালে এমন তেঁতুল গোলা হত না।

গুণনিধি তারাপদ ইতিমধ্যে বার তিনেক ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে হা হা হা, বাংলা বানানে বিয়ের দিকে এগিয়ে বসে আছেন। ওদের বংশে সাত সকালে ছেলের বিয়ে দেওয়া রীতি। তাই পাশ করুক, না করুক, পাত্রী খোজা চলছিল। বিজনেসম্যান বাপ, রাণীগঞ্জে কয়লা খনির শেয়ার, পয়সা আছে। তা সেই বাঁদর তারাপদ একদিন দাঁত বার করে একখানা ফটো এনে দেখাল।

বলল, দ্যাখ, এই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেল।

ছবিখ না দেখে তখন বুঝলে হে তোমরা, আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ইচ্ছে হল বাঁদরটার গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে, ছবিটা কেড়ে নিই। এই মেয়ে ওই শূয়োরটার হাতে পড়বে।

কিন্তু ছবিখানা কেড়ে নিয়ে আর কী লাভ বল? আসল জিনিসটা তো হাতের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে? তাকে তো আর কেড়ে নেবার এলেম নেই।

ছবিটা পকেটে পুরে হ্যা হ্যা করে বলল, কেমন দেখলি বল! তারাপদর পছন্দ আছে কিনা! হ ড গরীবের মেয়ে, কিছু দেবেটেবে না বুঝলি, বাবা নাকচ করে দিচ্ছিল আমিই ঝুলে পড়লাম। যাক

বরযাত্রী যেতে হবে ভাই। আগে থেকে বলে রাখছি। মেয়ে ওই রাণীগঞ্জেরই। কাজেই একেবারে তিন দিনের মত বুক করে যা তোকে। বৌভাত সেরে তবে ফিরতে পাবি।

ব্যাস হয়ে গেল উল্লুক অজিত ঘোষালের দফা গয়া। ভবিষ্যতের বারোটা বেজে গেল। চোখের সামনে কেবলই সেই ছবির মুখ। আহা লজ্জা পাবার কিছু নেই। এ তো সেই বেকুব অজিত ঘোষালের গল্প।

টেপটা একবার একদম বিলীন করে দিলেন দেবী! শুধু একটু বিজবিজ শব্দ চলতে লাগল। এ গল্প তাঁর জানা। কীভাবে ওই হতভাগা অজিত শয়নে স্বপনে সেই মুখ ধ্যান করতে লাগল, কীভাবে বরযাত্রী গিয়ে সেই মুখ প্রাণের মধ্যে খোদাই করে ফেলল, তার কাহিনী দেবীর বহুবার শোনা। সিঁড়ির সামনে কোলাপসিবল, তার সামনে ভারী পাল্লার কাঠের দরজা। ওদিক থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই, তবু জনা তিনেক মহিলা উগ্র কৌতূহলে ভয়ঙ্কর একটা অলৌকিক ঘটনার অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে স্পন্দিত বক্ষে বসে আছেন সিঁড়িতে। বসে আছেন, সেটা চট করে ধরা পড়ার ভয় নেই। ওই কাঠের দরজাটার জুজোড়া ছিটকিনি! খুলতে যে শব্দ হবে, এবং টাইম লাগবে তার মধ্যে সহজেই কেটে পড়া যাবে। কিন্তু মা কি হঠাৎ খুলবেন দরজা? মা কি সজ্ঞানে আছেন? সকলের শোওয়ার পর মালতী আর দুজন মহিলা ঠিক করলেন 'মায়ের' একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। আমরা তো যাহোক কিছু মুখে দিলাম। মা সেই শরবতটুক ছাড়া ··কি জানি কেমন থাকবেন। ধীরে ধীরে এসেছিলেন পা টিপে টিপে কিন্তু দরজার কাছাকাছি এসে স্রেফ পাথর হয়ে গেলেন তাঁরা। এ কী! এ কার হাসি! এ কার কণ্ঠস্বর।

তিনজনে তিনজনকে ধরে সিঁড়িতেই বসে পড়লেন। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়।

ইসারায় বাক্যালাপ।

দিদি শুনতে পাচ্ছেন?

এ তো হতেই হবে। ঠাকুর কী আর এ আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে পারবেন? আর মা? নিত্যসিদ্ধ মা, এই ভাবেই ইহলোক পর-লোকের মধ্যে যোগসূত্র রেখে চলবেন। কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, শুধু অনুভব করা যাচ্ছে কথা হচ্ছে। একটানা কিছু বলে চলেছেন ঠাকুর।

বোধ হয় তাঁর ফেলে যাওয়া আরব্ধ কাজের ভার দিয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন মাকে।

খবরটা রটে গেল নিঃশব্দে, একজন দুজন করে আরো অনেকেই এসে বসলেন, এবং সেই 'অলৌকিক' বাক্যবিন্যাস শুনে চললেন। কথোপকথনই হচ্ছে। না হলে মাঝে মাঝে হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে কেন!

তার মানে, মা একা থাকবেন না!

জিগ্যেস তো করা চলবে না।

মাথা খারাপ। যন্ত্রটার স্বরগ্রাম আবার একটু বাড়িয়ে দিলেন দেবী। আবার হঠাৎ হা হা হাসি শুনতে পেলেন। আবার চমকে উঠলেন।

নিজেকে নিয়ে একী অদ্ভুত কৌতুক।

নাকি 'সুষমা' নামের সেই বেইমান মেয়েটার উপর প্রতিশোধ?

যেন, ওঃ! তুমি আমার মুখোশ ছিঁড়ে দেবে? পরোয়া করি না। আমিই আমার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট—ধ্বংস করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেব।

কীরে সেই গুনধর অজিত ঘোষালকে কেমন লাগছে? বিয়ে উপলক্ষ করে বাপের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল ব্যাটার। যাবে নাই বা কেন বল? বাপ যদি টাকার লোভে একটা আলকাতরার টিনের সঙ্গে ছেলের বিয়ের ঠিক করে, চটাচটি হবে না? তবে বিয়ে সে করত না। বাপ টাকা বন্ধ করল, এম. এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। ছোঁড়া একটা ইস্কুল মাস্টারী ধরল। কেটেও গেল দু বছর। তারপর এল ভাগ্যের পরীক্ষা। সেই তারপদটা? শয়তানটা মধ্যপ্রদেশের একটা টাউনে

ওভারসিয়ারি করছিল। বোধহয় বাপের জোরেই পেয়েছিল কাজটা। তা সে হঠাৎ তার পুরানো বন্ধুকে চিঠির ওপর চিঠি - তোদের তো বছরে বারোমাসের মধ্যে তেরোমাস ছুটি, একবার কোন ছুটিতে চলে আয় এখানে। ছুটিটা কাটিয়ে যা। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাড়িটা চমৎকার আর তোর বন্ধুপত্নীর রান্না। চেহারাটাই দেখছিস গুণটা তো দেখিসনি? দেখে যা। এমন তোফা রান্না, এলে আর যেতে ইচ্ছে করবে না তোর। জানিনা এটা ওর বৌ সুষমার প্রেরণাতেই কিনা। হয়তো সে বেচারী একা ওই রকম একটা জানোয়ারের সঙ্গে ঘর করতে করতে হাঁফিয়ে উঠছিল। হয়তো বরকে বলেছিল, 'এতো সুন্দর জায়গা, এখানে তো তোমার বন্ধু-বান্ধব বেড়াতে আসতেও পারে।'

অথবা তারাপদর মধ্যেকার সেই বন্ধুত্বের স্মৃতি চাড়া দিয়ে উঠেছিল। জানোয়ারের মধ্যেও এক ধরনের ভালবাসা থাকে তো!

জানি না আসল ব্যাপারটা কী; তবে খাল কেটে কুমীর আনল তারাপদ।

তারপর?

তারপর এক লোমহর্ষক কাণ্ড রে ব্যাটারা। একেবারে তোদের হিন্দী সিনেমার গল্পের মত। যেমন হয়, আগে থেকেই আকৃষ্ট অজিত রাস্কেল বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসে, তার রূপে এবং গুণে নতুন করে আকৃষ্ট হতে থাকল, আর তার যন্ত্রণাটা অনুভব করতে লাগল। একটা জানোয়ারের সঙ্গে 'ঘর করা' কি কম জ্বালা রে? সহানুভূতি থেকে ভালবাসা একদম মহাসমুদ্রের মত গভীর হয়ে চলেছে। ইস! কী দুঃখী!

ওই সহানুভূতির বশেই একদিন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে, হঠাৎ বিনা নোটিশে হাণ্টার হাতে তারাপদ। ব্যাস বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর পিঠে শপাশপ সেই চাবুকের ঘা। আহা বেচারা অজিত ঘোষাল—বাকী জীবনটা সেই ঘায়ের ক্ষতচিহ্ন বুকে পিঠে বয়ে বেড়ালে। তবে এতদিনে দেহটা ভস্ম হয়ে চিহ্নটা মুছল বোধহয়।

চাবুক খাওয়ার পর, সিনেমা ফিনেমায় যা হয় তাই। চাবুক

খাওয়ার পর মহাত্মা অজিত তাঁর সেই পাষণ্ড বন্ধুটাকে খতম করে ফেলে রেখে বন্ধু পত্নীটিকে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেলেন।

অবশ্য অজিতটার প্রতি একটু বেশী অবিচার হয়ে যাচ্ছে, 'খতম' করার সদিচ্ছা নিয়ে বাপু খতমটা করেনি সে। সেই সদিচ্ছাটি নিয়ে তাড়ি খেয়ে চুরচুরে তারাপদ বাবুই বন্দুকটা বাগিয়ে এসেছিলেন পুরনো বন্ধুকে তাক করে, কিন্তু বন্ধু এবং তাঁর ঘরশত্রু বিভীষণ গিন্নীটির টানা-টানিতে কেমন যেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। তবে পালিয়ে আসার পথে সুষমা একটা বুদ্ধির কাজ করেছিল। খুন, খুন, ডাক্ ডাক্! বলে চেঁচিয়েছিল। উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকজন ছুটে আসবে। যদি মরে না গিয়ে থাকে তো ডাক্তার ডাকবে। আর এটাই ধরে নেবে সবাই, ডাকাত পড়ে ওভারসিয়ার সাহেবকে গুলি করে তাঁর সুন্দরী স্ত্রীটিকে নিয়ে পলায়ন করেছে। তা তদবধি আর জানা যায়নি, মাতালটা একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল না, জীইয়ে উঠেছিল। কে খবর নিতে যাবে?

মনের মধ্যে তো অহরহ পিছনে পুলিশ তাড়া করে ফিরছে। দেখ, দেখছিস দাস অনন্তানন্দের হিষ্ট্রী।··· কিন্তু টেপটা বোধহয় হুট করে জবাব দিয়ে বসবে। সংক্ষেপ করি। অতঃপর অজিতবাবু সেই কোহিনুর হীরেটিকে বয়ে বয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তবু হঠাৎ যে পালিয়ে বেড়াতে পেরেছিল, সেটা বোধহয় ভগবানদত্ত দামী টিকিট দুটোর জোরে। অজিত ঘোষাল আর সুষমা ভট্চার্য—নাম দুটো যতই সাধারণ মার্কা হোক্ চেহারা দুখানা তো বেশ অসাধারণ মার্কা গোছের। চট করে কেউ একেবারে ছুরছাই করতে পারছিল না। শুধু এক ব্যাটা ধর্মশালার মালিক—যাকগে মরুকগে। তবে এটা ঠিক যতই ওই দুটো ছেলে আর মেয়ে স্বামীস্ত্রী বলে পরিচয় দিক, কিছুতেই যেন কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চায় না। সন্দেহ করে। কেন কে জানে!

এদিকে হাতে নেই পয়সা, দুর্দশার চরম। সুষমার গায়ে যা সোনা ফোনা ছিল সে তো বিক্রমপুরে চলে গেছে। হয়তো এই অবস্থাটাই লোকের সন্দেহের কারণ। একটা ভদ্রব্যক্তি যদি গরীবই হয়, বেকার

হয়, সে তো আর তার একখানা সুন্দরী তরুণী বৌকে নিয়ে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় না ? এই দুরবস্থার মধ্যে আর এক বিপদ, সেই চাবুকের ঘাগুলো সেপটিক ফেপটিক হয়ে একাকার কাণ্ড। বোঝ ব্যাপার ! তোদের গুরুদেবের ইতিহাস বলতে এই যন্ত্রটার শরণ নিয়েছি কেন বুঝতে পারছিস ? সামনে বসে শুনলে ইত্যবসরে তো তোরাও মারমুখী হয়ে গুরুর ইহলীলা শেষ করে দিতিস। এ কাজ একেবারে সে লীলা শেষ করে তবে শোনাতে বসেছি। সুষমা ? সে নিশ্চয় তার আগেই আশ্রম ত্যাগ করবে। সে তো সারাক্ষণ যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছে এই জালিয়াতী, এই জোচ্চুরির জীবনের মধ্যে পড়ে থাকতে। যাক কী বলছিলাম ? আর এক বিপদ তাই না ? বিপদ হল ওই ক্ষতর চিকিৎসা করতে কোনো দাক্তার হাসপাতাল রাজী হয় না: সন্দেহ পুলিশের মার। অবশেষে দোরে দোরে ঘুরে মাননীয় অজিত বাবুর জ্বরে বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় স্ত্রিং। আর বেচারা সুষমা, খিদেয় তেষ্টায় হাঁটার কষ্টে সেখানেই মৃতবৎ। এই অবস্থায় ব্যাটা অজিতের ওপর হঠাৎ কী সুবাদে যে ভগবানের করুণা বর্ষিত হল জানি না। ব্যাটা তো কট্টর নাস্তিক ছিল ! কোথা দিয়ে যে কী হয়।

ওই দুটো হতভাগাকে দেখতে পেয়ে কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানের সাধু তুলে নিয়ে গেলেন যত্ন করে, সেবা করলেন, যত্ন করলেন, আহার ওষুধ দুই জোগালেন। যতদিন না তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল ছাড়লেন না। তা এক দিন তো ছাড়বেন ? কিন্তু আশ্চর্য সেই সাধু স্বামীজী, এক দিনের জন্য প্রশ্ন করেননি, আমরা কে ? কেন ? কোথা থেকে ? কী ইতিহাস ? হয়তো—ব্যাপারটা স্রেফ জীবসেবাই। পথ থেকে কোনো আতুর আহত পশুপক্ষীকে কুড়িয়ে নিয়ে যখন ওরা শুশ্রূষা করেন, তখন তো তোদের ইতিহাস জানতে যান না। কী আর বলব রে ব্যাটা, ওই ওনাদের দেখে শালা অজিত ঘোষালের মাথায় একখানা মার কাটারী প্ল্যান এসে গেল। আচ্ছা, দুজনে দুখানা সাধুর খোলশ পরে নিলে কেমন হয় ? এই যে এনারা ? চাকরী বাকরীও করছেন না, বিজনেসও করছেন না অথচ কেমন মহাসমারোহে জীবসেবা মানবসেবা করে

চলেছেন। নিজেদেরও চালাচ্ছেন। ব্যাস, সেই শুরু। হঠাৎ একদিন নিজেই দেখে অবাক। বেনারসে অহল্যাবাইয়ের ঘাটে দুই গেরুয়া পরা সাধু সাধুনী। সাধু তত্ত্বকথা বলছেন আর বেশ চারটি লোক জড় হয়ে হাঁ করে শুনছে। ওরে হ্যাঁ হ্যাঁ। গোড়ায় গেরুয়ার খোলশই ছিল, ওটাই তো চুম্বক পাথর। ভারতবর্ষের যতই অধঃপতন হোক, আর ভারতবাসী যতই বেহেড হতে থাকুক গেরুয়াকে এখনো সমীহ করে, সম্মান করে, জায়গা দেয়। কাজেই ওরই জোরে বেশ একটু জায়গা করে নিল অজিত ঘোষাল আর তার সহধর্মিনী। আর সেই সময়ই কে যে কখন তাঁকে 'দেবীমা' বলতে শুরু করল দেবতারাই জানেন। আর হঠাৎ জানতে পারলো অজিত, তিনি হিমালয় থেকে তপস্যা অন্তে নেমে এসেছেন এবং তার বয়েসের গাছপাথর নেই। তপঃশক্তিতে এমন তাজা শরীর। হা-হা-হা! কেউ কেউ আবার এমনও বলতে লাগল হর পার্বতী। কৈলাস থেকে মর্তে নেমে এসেছেন হাওয়া বদলাতে।

ওরে মাথায় ভাবনা ঢুকে গেল অজিতের। আর সেই এই গেরুয়ার প্রতিই সমীহর বশেই ত্যাগ করল সে। নাঃ, এটা ঠিক নয়। এটা অন্যায়। তবে খোলশ ছাড়ার আগে বেনারস ছাড়তে হল। নইলে লোকগুলো শক্ খেতো। এই যেমন এখন তোরা খাচ্ছিস।

কিন্তু কি আর বলবো রে বাবা! অজিত ছাড়লেও, কমলি ছাড়ল না। বঙ্গভূমে ফিরে এসে দেখা গেল, সাদা কাপড়ধারী 'হরপার্বতীরও' —ডিম্যাণ্ড কম নয়। তা' তোদের ওই দেবীমাকে চওড়া লালপাড় দুধসাদা শাড়ী আর সিঁদুরে ফিঁদুরে দুর্গা প্রতিমা দেখায় কিনা? কাজেই ওঁর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ব্যাটা অজিত ঘোষালকে কবরের তলায় চলে যেতে হল। জন্মগ্রহণ করলেন দাস অনন্তানন্দ!

কী? মার মার করে চেঁচিয়ে উঠছিস তো? কিন্তু আমার এখন কলাটি, কচুটি। তেলি হাত ফসকে গেলি। চন্দ্রবিন্দু হয়ে বসে আছি। এখন কাকে মারবি মার। তাকে মারতে যেতে হলে তো চন্দ্রবিন্দু হয়ে যেতে হবে। তবে ছাখ অজিত ব্যাটার 'মৃত্যু' ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কোথা দিয়ে যে কী ঘটতে লাগল। কোথা থেকে ভক্ত জুটছে,

কোথা থেকে পায়ে ফুল চন্দন, কোথা থেকে এই মঠ মন্দির আশ্রম। কোথা থেকে হয়ে যাচ্ছে রাজসূয় যজ্ঞ লোকটা জানে না। ভেতরে তো সে একটা ঠগ জোচ্চোরই রয়ে গেছে। এই ছ্যাখ না প্রতিদিন যে তোদের 'ধর্ম কথা' শোনাই, সে কি আমি? সব তো সাজানো কথা। আর যত শোনাতে থাকি তত চাষ বাড়ে, তত ফসল ফলে।

বাড়ছে ভক্তের সংখ্যা। বাবা আর মা বলতে তো অজ্ঞান।

দিন যাচ্ছে না জল যাচ্ছে। একবার তলিয়ে বসে ভাববার সময় নেই, আমি লোকটা কী? কেন? যেন ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে যাচ্ছি।

নইলে যে লোকটাকে ভিক্ষের আশায় ভেক নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল সে কী করে আশ্রম বানাচ্ছে ইস্কুল বানাচ্ছে, লাইব্রেরী বানাচ্ছে, আরো পঞ্চাশটা বানাবার শখ মাথায় নিচ্ছে।

তাই মাঝে মাঝে একটু তলাতে পারলে ভাবি, যে জীবনের খোলশটাতেই এত মান, এত সম্মান, এত ভালবাসা, এত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি আর এত আনন্দ সেই জীবনটার সত্যতার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে না জানি কত আনন্দ!

কিন্তু কপালটা তো বর্ধমানের শশী ঘোষালের জন্মেই মা খেয়ে ফেলা ব্যাটাটার! তাই এ জন্মে তাকে ওই ভানের আনন্দটুকুই পান করে বিদায় নিতে হচ্ছে। 'ভানানন্দ' থেকে জ্ঞানানন্দ হবার চেষ্টা-টুকুরও টাইম নেই। তবে আর ওই খোলশখানা গায়ে সেঁটে ফটো হয়ে দেওয়ালে ঝুলি কেন? ওখানা খুলে ফেলে চিতাভস্মে নিক্ষেপ করে গেলাম।

ছ্যাখ, সাধে বলি জ্ঞান আর বিজ্ঞান দুই ভগবান। বিজ্ঞানকে ভগবান না বলে উপায় আছে? এই যে তোদের শোনাবার জন্যে মরণোত্তর ভাষণ রেখে যাচ্ছি, বিজ্ঞানের অবদানেই তো?

মাথায় হাতুড়ীটা বসানোর পর তোদের মুখের চেহারা কী রকম হয়ে গেল চোখে দেখতে হল না তো? অথচ হাতুড়িটি তো বসাতেই হবে। একটা কোনো আদালতে ফাদালতে গিয়ে পড়ে কাঠগড়াতে তো দাঁড়াতেই হবে?

আশীর্বাদ করার আস্পর্দ্ধা করব না, কোনদিনই করিনি, 'ভানানন্দেই' যা করতে পারি করেছি, তবে শুভকামনা করতে তো আর অধিকার লাগে না? সেটাই করে যাচ্ছি। আরে না না যাচ্ছি আবার কী? এখন তো গিয়েই বসে আছি। মানে তোরা যখন এই 'অমৃত-বাণী' শ্রবণ করছিস, তখন। আচ্ছা গুড বাই!

ইতি তোদের ঠগ জোচ্চর জালিয়াৎ ভেজালের কারবারি বাবা!

পুনশ্চ যেটা সব থেকে দরকারি কথা, সেটাই বলি। স্পেশাল করেই বলি। তোদের দেবীমা, কিন্তু একদম খাঁটি। একদম আগ মার্কা। ওঁর মধ্যে কোনো ভেজালের কারবার নেই।

এই ভেজালটার পাল্লায় পড়ে বেচারী মনে বড় কষ্ট পেয়েছে। বড় যন্ত্রণায় কাটিয়েছে। ওকে তোরা একটু সহানুভূতির চক্ষে দেখিস। একের পাপে আরের দণ্ড না হয়। ওই দুঃখী মানুষটার জন্যে আমার মরেও স্বস্তি নেই।

আমি ওকে—

থেমে গেল যন্ত্রটা। ফিতেটা জবাব দিয়েছে।

'আমি ওকে'র শেষটা কী, জানবার উপায় নেই আর।

মাথাটা নীচু করে ওই যন্ত্রটার ওপরই রাখলেন দেবী! দামী যন্ত্রটা লোনা জলে ভেসে যাচ্ছে।

গতকাল রাত্রি থেকে যে অফুরন্ত লবণাক্ত জলরাশি জমাট হয়ে আটকে ছিল সেই বরফ গলছে তো গলছেই।

যে ক'টি অতি উৎসাহী মহিলা বন্ধ দরজার ওপারের অলৌকিক 'আলাপচারণের' মর্মোদ্ধারের চেষ্টায় সারারাত বসে বসে ঢুলছেন, তাঁরা ভোরের আলো ফোটার আগেই নেমে এসেছেন, এবং দিব্যজ্যোতি মুখে মেখে, নীচের তলায় পড়ে থাকা দিদিদের দুয়ো দেবার ভঙ্গীতে আপন অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা শোনাতে থাকেন।

ঘুমিয়েই কাটালেন দিদি, কী জিনিসই হারালেন।

সেই তো সেই কথাই তো বলাবলি করছিলেম আমরা, ঘুম তো চিরকালই আছে, কিন্তু এ জিনিস?

সারারাত। রাতভোর। 'মা আর বাবার' কত কথা, কত গল্প, কত হাস্য পরিহাস।

বাবার কথাই। অবশ্য বেশী। হবেই তো, মাকে তাঁর কর্মের নির্দেশ দিয়ে যাবেন না?

আর তাঁর আত্মা তো এইখানেই ঘুরবে। যত বড় বড় জায়গাতেই যান, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর-কাশী, কাঞ্চী, কানপুর ইত্যাদি করে হাতের কাছের পুরী ভুবনেশ্বর আসানসোল দুর্গাপুর কোথায় না গিয়েছেন। কিন্তু এই নিমপুরটিই ছিল ওঁর প্রাণের জায়গা। তাঁর নিজ নিকেতন।

সে তো হবেই মিসেস মুখার্জি, যে সব জায়গায় উনি আমন্ত্রিত, শুধু আদর ভালবাসা ভক্তির পাত্র, কিন্তু এটি? এটি ওঁর নিজের হাতে গড়া নিজের মন্দির।

কী জানি সারারাত কী বললেন উনি মাকে।

মা কি ব্যক্ত করবেন?

কী জানি। বাবার যদি আদেশ থাকে তো করবেন, নচেৎ তো নয়।

তবে বাবা নিজে থেকে যে 'শেষবাণী' আমাদের জন্যে রেখে গেছেন সেটি তো আর একটু পরেই শুনতে পাওয়া যাবে।

ক্রমে পুরুষদের কানেও গতরাত্রের সেই ব্যাপারের কথা।

যারা সিঁড়িতে বসে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা খেলার মাঠে শীল্ড বিজয়ীর মত আত্মমগ্ন গৌরবের ভূমিকায় সকলের কাছে কাছে যাচ্ছেন একবার করে।

যাক যাক, মিস করছে তারা আর কী করবে। শীল্ড বিজয়িনীদের দিকে ঈর্ষার চোখে তাকানো ছাড়া?

এখন সেই শেষ অমৃতবাণীর অপেক্ষা।

তবে অপেক্ষা করতে হবে!

অধীর আগ্রহে মিনিট গুনলেও, 'সময়' না হলে তো হবে না।

আজকের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সময় ধার্য করেছেন বেলা নটা।

কারণ দূরদূরান্তর থেকে লোক সমাগমের কথা। তাদের তো বঞ্চিত করা চলবে না?

রাজা চলে গেলেও রাজ্যের নিয়ম চট করে চলে যায় না। এখানের নিয়ম অভাগা অভ্যাগতদের কথা বিশেষ করে ভাবা।

আবার হয়তো শ্রোতারাও কেউ কেউ তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন বিজ্ঞানের পরমদান ওই 'রাজবন্দী' করে রাখার যন্ত্র। নিমপুর বলে যে সবাই পিছিয়ে আছে এমন নয়। এখানেরও অনেকের আত্মজন দেশ-বিদেশে ঘরকন্না করছে। তাদের দেওয়া উপহার থাকতে পারে।

অতএব টেপ থেকে টেপান্তরে গ্রহণ করে করে এ বাণী সকল ভক্তের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে সঞ্চিত থাকবে।

ইত্যবসরে মুকুন্দ আর মালতী গতকাল থেকে ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত জনেদের জন্যে মোটা প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, যাতে নটার আগেই সেরে ফেলা যায়।

না না, দাস অনন্তানন্দের নিয়মের খাতায় 'উপবাস' করে কোন কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দেবার নির্দেশ দেওয়া নেই।

উনি বলতেন, না খেয়ে ঠাকুর দর্শন? না খেয়ে নামকীর্তন? আরে বাপ! বলিস কী? পেট জ্বললে ভেতরে স্ফূর্তি আসে? শক্তি আসে? দূর ওসব সেকেলে নিয়ম ছাড়। খাবি মাখবি, আনন্দে থাকবি। কথায় বলে, 'প্রসন্নমন নারায়ণের আসন!' তা পেট খালি থাকলে কখনো মন প্রসন্ন থাকে রে?

তাই না এখানের ভক্তরা এত আনন্দে থাকে?

অতএব বড় বড় ডেকচি করে চায়ের জল চেপেছে, বড় বড় কড়া ভর্তি হালুয়া নেমেছে, গামলা গামলা লুচি।

বাবার উপদেশ স্মরণ করুন মালতীদি। কাল থেকে সবাই উপবাসী, বাবার আত্মা ছটফট করছে।

কিন্তু মা?

মা কখন নামছেন?

মা কখন একটু জলগ্রহণ করবেন?

বিশেষ করে অন্তত এক কাপ চা।

বাবা তো ছিলেন চায়ের পোকা। কী বলেন মিত্তির মাসিমা? যতবার দাও, না নেই।

আবার এও বলতেন, 'আমি আর একবার খেতে চাইলে, তোদেরও বাড়তি একবার হয়ে যাবে কী বলিস? হা হা হা।'

ওঃ! এই হাসির আভাস শুনেছি কাল রাত্তিরে—এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

অতঃপর চায়ের পালা সাঙ্গ হল।

এবং নিয়ম অনুযায়ী নামগান শুরু হল। তবে আজ আর উৎফুল্ল আনন্দের উল্লাসধ্বনি নয়, আজ নাম হচ্ছে মৃদু করুণ সুরে।

যেন শ্রীরাধিকার বেদনা বিদ্ধ হৃদয়ের করুণ কাতরোক্তি।

এই সুরধ্বনি কানে যেতেই চমকে তাড়াতাড়ি সেই নীচু করা মাথাটা তুললেন দেবী।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সেই টেপ রেকর্ডারটার ওপরই।

কখন?

ঠিক মনে পড়ছে না।

যন্ত্রটা হঠাৎ বোবা হয়ে গেলে কতক্ষণ ধরে যেন ভেবে চলেছিলেন, —আমি ওকে—আমি ওকে—

কী সেই কথা? কী ওকে?

এই অসমাপ্ত কথার পাহাড়প্রমাণ ভার বাকি জীবনটা বয়ে বেড়াতে হবে তাঁকে। ওই যন্ত্রটার ওপর আছড়া-আছড়ি করলেও ও বলে দেবে না শেষটুকু।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

কী আশ্চর্য! কবে কখন তিনি এই দীর্ঘ স্বীকারোক্তিটি বাক্যবদ্ধ করে রেখেছিলেন, একদিনে? একসনে? বোধ হয় নয়। দিনে দিনে একটু একটু করেই হয়তো। না হলে তাঁর দেবীজীর অজ্ঞাতসারে কী করে সম্ভব হয়েছিল?

কিন্তু তিনি কি দেবীর অজ্ঞাতসারে রাখতে চেয়েছিলেন এটা? হয়তো নয়। তিনি তো বলতেই চেয়েছিলেন. জানাতেই চেয়েছিলেন। সুষমা অবজ্ঞাভরে বলেছে, দোহাই তোমার, আমার জেনে দরকার নেই।

যদি সেদিন সুষমা অমন ভুলটা না করতো? যদি শুনতো! তাহলে নিজেকে হেনস্থা করা ভাষায় রচিত এই সকৌতুক স্বীকারোক্তিটির মধ্য থেকেই আবিষ্কার করতে পারতো, একটি ক্লান্ত. ক্লিষ্ট, অপরাধপীড়িত আত্মার আশ্চর্য এক আনন্দলোকে পৌঁছে যাওয়ার ইতিহাস। অনেকদিন আগে একদিন সুষমার স্বামী নামধারী সেই লোকটা তার বন্ধুকে কাঁটার চাবুক মেরে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। আর সুষমা? বাকি জীবনভোর তাকে আপন ক্ষুদ্র চিত্তের অতৃপ্ত বাসনার চাবুক মেরে বিক্ষত করতে চেষ্টা করে চলেছে।

চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু বিক্ষত করতে পেরেছে কী? সে তো সর্বদা আনন্দের সাগরে ভেসে থেকেছে। চাবুকটাকে ফুলের ঘা বলে গ্রহণ করেছে। সেই আঘাতকারিনীকেই পরম মমতায় পরম ভালবাসায় আগলে রেখেছে। সুষমা নিজেকে খুব উঁচু ভেবে তার মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছে, তার ভাবমূর্তির গায়ে কালি ছিটোতে চেয়েছে। অথচ কত সহজেই সেই সদাহাস্য মানুষটা সেই মুখোশ নামিয়ে রেখে সেই ভাবমূর্তির গায়ে নিজের হাতে কালি ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মৃত্যুর পরে বলে?

মৃত্যুর পরের সম্পর্কেই কি মানুষ উদাসীন হয়? বরং সেই পরবর্তী কালটার জন্যেই বেশী চিন্তা করে। ভাবমূর্তিটিকে বেশী করে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করে।

এই স্তব্ধতার মধ্যে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন. ঘুমটা ভেঙে গেলে ওই শোকার্ত সুরের নামকীর্তনের করুণ মূর্ছনায় শব্দে।

তাড়াতাড়ি ঘর সংলগ্ন স্নানের ঘরে ঢুকে গেলেন। হ্যাঁ স্নানের ঘর তো থাকবেই। অনন্তানন্দ যে একেবারে ফ্রেশ হয়ে সকলের সামনে আসতে ভাল বাসতেন। সেই নেমে আসাটিও দেখবার মত।

ভারী শৌখিন সাজ-সজ্জায় সাজতেন, কী একটি সেণ্ট মাখতেন, ফুল-চন্দনের গন্ধ পাওয়া যেত গা থেকে। 'সাধু সন্নিসীর এত সাজ!' দেবী বলে উঠতেন এক এক দিন, 'লোকের দৃষ্টিকটু লাগে না?'

কিন্তু অনন্তানন্দকে পেরে ওঠার সাধ্য দেবীর? তিনি বলে উঠতেন, এর মধ্যে তোমার দুটো পয়েন্টই কাঁচা। এক নম্বর, আমি নিজেকে 'সন্নিসী' বলে ক্লেম করি না, আর দু নম্বর দৃষ্টিকটু লাগবার লক্ষণ তো দেখি না। কটু লাগলে না এলেই পারে। কেউ তো সাধতে যায় না।

লোকে না এসে পারলে তো? ওই মোহিনী মায়াতেই তো বিভোর।

তবে আর আমার দোষ কী?

আপনি নিজেকে সাধু-সন্নিসী বলে দাবী না করলেও, লোকে তো তাই বলে।

আমি নাচার। লোকের মুখে তো তালাচাবি লাগাতে পারি না।

আবার হয়তো এও বলতেন, আমি অবশ্য ভগবানের তত্ত্বটত্ত্ব বুঝি না, তবে বলি, ভগবানের সঙ্গে সুন্দর সাজ-সজ্জার কোনো বিরোধ আছে? কবির কথাতেই তো আছে এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ। এই যে তুমি সাজায়ে রেখেছ। এই যে তুমি চওড়া লাল-পাড়ের গরদ শাড়ী সিঁদুর টিপ ফিপ পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আস, দেবীর মতই লাগে কি না!

আমি তো পরতে বাধ্য হই বলেই পরি। লোকে কেবলই 'মাকে' প্রণামী শাড়ী দিয়ে দিয়ে ঘর বোঝাই করে।

তিনি হাসতেন, 'লোক' তো নিমিত্তমাত্র। যাক গে, আসল কথাটাতেই এসো, লোকে বলে কিনা দুর্গা প্রতিমার মত।

বলে তো কী হল?

লোককে আনন্দ দেওয়া হল।

এই রকম সব অদ্ভুত আর বাজে বাজে যুক্তি ছিল তাঁর।

তবু দেবীমাকেও ওই মা দুর্গার সাজে সেজে ভেট সভায় আসতে হতো। চওড়া নীল পাড় গরদের শাড়ী, গরদের মত গায়ের রঙটিও।

নিটোল মসৃণ হাতে শঙ্খ বলয়। কপালে সিঁদুর রেখা, পিঠে ভিজে এলো চুলের ঢাল।

নেমে আসতেন আর বলতেন, এই যে নামছি। মেক আপটাপ সারা হল। আজ আর কথাটা কাউকে বলবার নেই, তবু তেমনি সাজেই নেমে এলেন দেবীমা যেমন নামতেন। তবে মনে মনে নিজেকেই বললেন, এই আজকের মত শেষ মেকআপ করলাম। নীচে নেমে গিয়ে সভা ঘরের মধ্যে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলব, এইবার আমার ছুটি। এবার আমায় মুক্তি দিন আপনারা।

উনি নেমে এলেন।

যারা এতক্ষণ ধরে অস্থির প্রতীক্ষা করছিল তারা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ওঃ! দেরী দেখে কী ভয়ই লাগছিল। না জানি, কী হতশ্রী মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়াবেন। তা করেননি। দর্শকদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মাকে দেখে সমাগত জন উঠে দাঁড়াল। মৃদু একটি গুঞ্জন উঠল। পরক্ষণেই পড়ে গেল সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতের ঘটা।

এরই মধ্যে, অস্ফুট গুঞ্জনের মধ্যে থেকে উচ্চকিত হয়ে উঠছে দুএকটি শব্দ।

মিছে ভয় করছিলুম, মা তো অজ্ঞানী নয়। ঠাকুর তো আর চলে যাননি।

ঠিক! ঠাকুর এখানেই আছেন, এখানেই থাকবেন। কাল রাত্রেই তো জানা গেল।

সকলের প্রণাম পর্ব সমাপ্ত হল।

প্রতিমার মত 'দেবী'মা একটু পিছিয়ে পিছিয়ে অভ্যস্থ নিয়মে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে অভয় মুদ্রা দেখালেন। যেমন দেখিয়েছেন এতদিন।

দেখিয়েছেন, তবে পরে রেগে রেগে বলেছেন, আপনার ভেজালের কারবারের পার্টনার হতে হতে ভেজালটি আমিও দিব্যি শিখে ফেলেছি দেখেছেন?

দেখেছি। আর মুগ্ধ হয়েছি। আজ এখনো সেই মুগ্ধকরা ভঙ্গী।

এইবার দুইহাত জোড় করে বলে উঠবেন সেই কথাটি।

সেই ছুটির প্রার্থনা।

কিন্তু এটা কি বলে বসলেন তিনি? এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাটা বলার জন্যেই কি আজও তাঁর এই মেকআপ নেওয়া? রিহার্সাল দিয়েই তো এসেছিলেন।

রিহার্সাল দেওয়া কথাটা প্রকাশের আগে একবার এখানে উপস্থিত জনেদের দিকে তাকালেন কেন কে জানে। দেখে যে অবাক হয়ে গেলেন।

এত লোক। ঘরে দালানে উঠোনে, উঠোন পেরিয়ে খোলা জমিতে, বাগানে, তিল ধারণের জায়গা নেই। আগে কী এমন দৃশ্য দেখেননি দেবী?

দেখেছেন বৈকী বরাবরই তো এরা আসে, আরো আসে। তবে সমাগতদের কলকল্লোলে মাথা ঘুরতো; আজ তার ব্যাতিক্রম। আজ সবাই শান্ত স্তব্ধ চুপ। হয়তো আজ হঠাৎ এদের দেখে অবাক হবার এটাই কারণ।

স্তব্ধতাই বোধহয় বিশালকে প্রকাশ করে। আর আজ একা দাঁড়িয়ে বলেও হয়তো। আর এক বিশালের পিছনে ছায়ার মত থাকতেন, ভাল করে কিছু নজরে পড়ত না। কিন্তু তখন কি বিশাল ম্লান মনে হতো?

এখন ওই অগণিত বিশাল জনের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন দেবীমা, কতখানি ভালবাসার সঞ্চয় থাকলে, এতজনের ভালবাসা কুড়ানো যায়। প্রাণের প্রাঙ্গণে কতখানি জায়গা থাকলে ঘরের প্রাঙ্গণে এত জনের জায়গা হয়।

কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য। 'দেবী' খালি ভীড়টাই দেখেছেন এতদিন, ওই ভালবাসাটি লক্ষ্য করেননি।

ভালই হয়েছে, এতজন। সকলের সামনে কথাটা বলে নেওয়া যাক। তাই বলতে গেলেন আর বলে বসলেন কিনা—'সকলের চা জলখাবার খাওয়া হয়েছে বাবা?'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না, তবু শুনলেন তো স্পষ্ট. কাল থেকে সবাই অনাহারে।

মা! মাগো। খেতে তো হবেই। ঠাকুর যে—

হ্যাঁ তাই তো। নামগান শুরু হবার আগে ভাল করে খেয়ে না নিলে বকতেন। বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কিছু দেওয়া সম্ভব হবে মুকুন্দ?

মুকুন্দ সচকিত হয়। অভ্যাগতদের প্রতি যে মায়ের খুব হৃদয়ভরা প্রীতি ছিল এমন তো মনে হতো না।

মুকুন্দ মাথাটা নাড়ল।

অর্থাৎ হবে, হতে পারবে।

কী হতে পারবে, কতটা হতে পারবে তা জানে না সে। তবু বলল। কারণ এখানে 'নেই' 'হবে না', 'কুলোবে না' এমন শব্দ উচ্চারণ করার নিয়ম নেই।

উৎসবের সময় অবশ্যই অনেক ব্যবস্থা মজুত থাকতো। দেবীমা তো রাগ-রাগ হাসির সঙ্গে বলতেন, পথ চলতি লোককেও ডেকে ডেকে প্রসাদ দিতে হবে মুকুন্দ?

মুকুন্দরও অবশ্য এতটা ভাল লাগত না। খাটুনী তো তারই, তবুও সেও হাসতো, কী করব মা, বাবার আদেশ।

কিন্তু এখন তো আজ তো উৎসবের দিন নয়, পরম দুঃখের দিন, কোনো কিছুই মজুৎ থাকার প্রশ্ন নেই, তবু হঠাৎ মা নিজে বলে বসলেন, এদের কিছু দেওয়া সম্ভব হবে মুকুন্দ? আশ্চয্যি বাবা।

যাক না যাক, মুকুন্দকে ঘাড় কাত করতেই হল। কীর্তনের একটা অংশ শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা শেষ হতেই ব্যারিস্টার মল্লিক বলে উঠলেন, দেবীমা।

উনি চোখ তুলে তাকালেন।

সেইটি বার করে রেখেছেন? বাবার এই অভাগাদের জন্যে রেখে যাওয়া শেষ আশীর্বাদ?

ওঁর সঙ্গে এগিয়ে এলেন ডাক্তার মুখার্জি, অ্যাডভোকেট মজুমদার, ইঞ্জিনীয়ার সমর ঘোষ (এঁরাই সভার সামনের সারিতে ছিলেন) বলে উঠলেন, হ্যাঁ মা, প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছি। ঠাকুর আমাদের জন্যে

কী রেখে গেছেন। একদিন বলেছিলেন, হেসে হেসে, 'যে 'বাণী' রেখে যাব তোদের জন্যে তোদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

রুমাল বেরোল কারও কারও পকেট থেকে। 'এমন করে কথা আর কেউ কখনো বলতে জানেনা মা।'

এই অবকাশে নিজের একটু স্মৃতিচারণের আশায় মুখার্জি বলে উঠল, আমাকে অনেকে মানে, বন্ধুবান্ধবরা বলতো, 'খুব যা হোক একখানা মাই ডিয়ারি গুরু পেয়েছো—'তো বাবার একদিন সে কথা শুনে কী স্ফূর্তি। বললেন, ঠিক বলেছে তো, কথাটার আসল মানেটা বুঝে ফেলেছে। মাই ডিয়ার মানেটি ভাব ?

গুরুদেবের সঙ্গে কার কতটা অন্তরঙ্গতা ছিল, সেই কথাটুকু বলার জন্যে সবাই উদগ্রীব। বলবেনও। স্মরণ-ভাই তো। তবে এখন যার জন্যে উৎকণ্ঠ প্রার্থনা, সেটার কাজ শেষ হোক।

কোথায় রেখে এসেছেন মা ? কেউ নামিয়ে আনতে পারবে ?

'মা' এই আবেগ ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত মুখগুলির দিকে আচ্ছন্নের মত একবার তাকিয়ে দেখলেন। চেনা-অচেনা কাছে-দূরে, অগণিত মুখ যেন একটা মাত্র অবয়ব নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। যে অবয়বটিরও একটি মাত্রই ব্যাখ্যা—উৎকণ্ঠ প্রত্যাশা।

এই একটু আগেই না স্থির সংকল্প ছিল, এবার মিথ্যার জাল উন্মোচন হোক। সেই সংকল্পের প্রতিমার মুখে ফুটে উঠল একটি করুণ হতাশা।

আস্তে মাথা নাড়লেন।

শুকনো গলায় বললেন, সেরকম কিছু তো পেলাম না বাবা।

পেলেন না !

প্রশ্ন তো নয়, আর্তনাদ যেন।

মা আরো শান্ত গলায় বললেন, না বাবা ! সব খুঁজেছি তন্ন তন্ন করে। সবই পুরনো !

বাবা যে বলেছিলেন মা—

হয়তো ইচ্ছে ছিল। হয়তো ভেবে রেখেছিলেন সময় পাননি, সময় পেলেন না।

সকলের মধ্যে থেকে একটা হাহাকার চাপা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল।

দেখে মনে হচ্ছে ওই প্রত্যাশাটির মধ্যেই যেন তাদের সব প্রাপ্তির সম্বল ছিল। যেন গতকাল যাকে চিরতরে হারিয়েছে, তাকে আবার ফিরে পেত, পেল না।

যাঃ! সব আশা ফুরোলো। আমাদের আর কিছু রইল না! কেউ মুখে, বাকি জনেরা মনের মধ্যে বলে উঠল কথাটা।

দেবীমা তাঁর অয়ত চোখ দুটি তুলে তাকালেন, মাথার আঁচলটা খুলে পড়ে গেছে, খেয়াল নেই। খোলা মুখে খোলা গলায় বলে উঠলেন, কেন বাবা, আমি তো রয়েছি! আমাকেই তো রেখে গেলেন তোমাদের জন্যে।

মা! মা! দেবীমা!

ওরে বাবা, ওরে বাবা পা ছাড়। ওঃ এই পাগলাগুলোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন তিনি!

মা, তুমি আমাদের ভার নিচ্ছ?

দেবীর মেকআপে অতএব দেবীর মতই অভয়বাণী!

ভার না নিয়ে উপায় কী বল? তোরা যে উদ্বাস্তু হয়ে গেলি বাবা। মাথা গোঁজার আশ্রয় তো চাই একটা? কংক্রীটের ছাতখানা উড়ে গেছে, একটা পাতালতা খুড়কুটোর ছাউনীর নীচেটাতেও এসে বসতে হবে।

হ্যাঁ বলে উঠলেন এই কথা, ওদের দেবীমা। যেরকম কথা শুনলে সেই সর্বংসহ, মানুষটাকে বলতেন, এতো ছেঁদো কথাও বলতে পারেন প্রভু! ছেঁদো কথার চাষ চলেছে বটে একখানা।

আর এখন উনি নিজেই বললেন, স্রেফ একখানা ছেঁদো কথাই।

অতঃপর হয়তো এই রকম বলেই চলবেন। সেই ছলনার যন্ত্রণাটা যখন অনুভবে আসছে না।

বলতে বলতে হয়তো মেকআপটা আর মেকআপ থাকবে না। যেমন থাকেনি পাষণ্ড অজিত ঘোষালের।

—শেষ—